মুণ্ডু
অজেয় রায়

BENGALIEBOOK.COM
BE
bengaliebook.com
বেঙ্গলিইবুক.কম
★2022★

মুখবন্ধ

যেদিন প্রথম ছোটদের জন্য দুঃসাহসিক অভিযানের গল্প লেখা শুরু হয়েছিল, সেদিন থেকে শিশুসাহিত্যের একটা নতুন দিগন্ত খুলে গেছিল। বলা বাহুল্য, এর সূচনা হয়েছিল ইয়োরোপে। এবং সে সময়ে শিশুসাহিত্যের কয়েকটি শ্রেষ্ঠ রত্ন দিনের আলোর মুখ দেখেছিল। রবার্ট লুইস স্টিভেনের ট্রেজার আইল্যান্ড, কিডন্যাপ্ড, জুল ভের্নের ছোটবড় সকলের জন্য লেখা নানান বিজ্ঞানভিত্তিক কিংবা অসমসাহসিক অভিযানের নানান বইয়ের গুণ আজ পর্যন্ত ম্লান হয়নি। পৃথিবীর অত্যাশ্চর্য বিস্ময়ের দিকটা চিরকালই ছোটদের মুগ্ধ করেছে। এ-ও তাদের বড় হওয়ার একটা বলিষ্ঠ দিক; অজ্ঞাতকে জানবার, দুর্গমকে জয় করবার, প্রতিকূল শক্তির সঙ্গে লড়বার, দেহ-মনের বল আহরণের প্রবল একটা দিক।

অনেক দিন আগেই বাংলায় এই ধরনের কিছু কিছু বই বেরিয়েছে, লেখকদের মধ্যে হেমেন্দ্রকুমার রায়ের নাম করতে হয়। তাছাড়া আরো আছেন। এই বইখানির রচয়িতা অজেয় রায় সেই জাতের লেখক, যাঁরা দুঃসাহসিক অভিযানের গল্প অতিশয় সরস ও সহজ ভাবে লিখতে পেরেছেন। এর মধ্যে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় সংবলিত আছে। অজেয় রায় কোনো তথ্য পরিবেষণ করার আগে, সেটি নির্ভুল কিনা সে বিষয়ে পরীক্ষা করে

নিতে যত্নবান হন। এইটি তার বিশেষত্ব। এমন কি দুটো একটা বিদেশী কথা ব্যবহার করতে হলেও, আগে শব্দগুলি সম্বন্ধে নিজে নিঃসন্দেহ হন, তারপর লেখেন। ছোটদের বইতে ভুল লিখলে চলে না।

এই ধরনের বই কোনো কোনো অভিভাবক স্রেফ রোমাঞ্চময়, নিকৃষ্ট শ্রেণীর লেখা বলে অপছন্দ করেন। তারাও এই বইখানি সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হতে পারেন, এর কাল্পনিকতা তথ্যপুষ্ট বলেই এত আকর্ষণীয়। রস ও কল্পনাশক্তিই হল সাহিত্যের প্রধান উপজীব্য। এ ছাড়া হাজার জ্ঞাতব্য তথ্যে পূর্ণ হলেও রচনা উরোয় না। ছোটরা আনন্দের সঙ্গে পাঠ করলে তবে না তাদের জন্য গল্প লেখা সার্থক হয়।

অজেয় রায়ের ছাত্র-জীবনের ও কর্ম-জীবনের পটভূমিকা হল গিয়ে শান্তিনিকেতন, কল্পনায় ভরা স্থান। তার বয়স চল্লিশের অনেক কম। ছোটদের আদর্শ লেখক তিনি।

লীলা মজুমদার

কলকাতা ১৫ মে, ১৯৭৫

.

ভূমিকা

কোনো বাঙালি ছেলের পক্ষে আফ্রিকা যাওয়াই একটা বিরাট অ্যাডভেঞ্চার। তার ওপরে সেখানে গিয়ে যদি তাকে সব লোমহর্ষক ঘটনার মধ্যে জড়িয়ে পড়তে হয়, তাহলে তো সোনায় সোহাগা! ডার-এস-সালাম পৌঁছনোর কিছুদিন পর থেকেই আমার জীবনে যেসব ঘটনা ঘটেছিল, আজ ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে এসে সেগুলোর কথা ভাবলে স্বপ্নের মতো মনে হয়। অথচ যখন ঘটেছিল তখন সেগুলো ছিল বিস্ময় ও বিভীষিকা মেশানো এক বিচিত্র অ্যাডভেঞ্চার। কত কথাই না মনে পড়ছে আজ!...মামাবাবুর সেই আশ্চর্য বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের মুহূর্তটা; ঢ্যাঙা উইচ ডক্টর কামাউ, টোটো, ডক্টর হাইনে, অল্পক্ষণের জন্য দেখা ডেয়ারিং বিল! আর মনে পড়ছে রুফিজি নদীর মোহনার সেই প্রলয়ঙ্করী ঝড়, যে ঝড় না হলে আমার কাহিনি একেবারে অন্য চেহারা নিত; কিংবা সে-কাহিনী হয়তো লেখাই হতো না।....

আফ্রিকা যাবার ব্যাপারটা যেভাবে ঘটেছিল সেটা অবিশ্যি তেমন চমকপ্রদ কিছু নয়। এর জন্য দায়ী আমার বন্ধু সুনন্দ। ঘটনাটা ঘটল সেপ্টেম্বর মাসে আমার শোবার ঘরে। তখন রাত এগারোটা। আমি বিছানায় শুয়ে বেশ জমিয়ে একটা ডিটেকটিভ বই পড়ছি, এমন সময় সুনন্দর আবির্ভাব। সময়টা বেয়াড়া, তবে সুনন্দর পক্ষে সেটা অস্বাভাবিক নয়। ঘরে ঢুকতে না ঢুকতেই সে প্রশ্ন করল, কীরে অসিত–আফ্রিকা যাবি?

কোথায়?

ইস্ট আফ্রিকা। টাঙ্গানিকা।

রাতদুপুরে এসে রসিকতা! কেটে পড়।

বইটা বন্ধ কর। রসিকতা নয়। সিরিয়াসলি বলছি। সম্প্রতি মামাবাবুর বন্ধু জার্মান বৈজ্ঞানিক ডক্টর হাইনে ডার-এস-সালাম-এর মিউজিয়ামের কিউরেটর হয়েছেন। তিনি মামাবাবুকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন কিছুদিনের জন্য তার অতিথি হতে। ডক্টর হাইনে আফ্রিকার প্রাগৈতিহাসিক যুগের প্রাণী ও উদ্ভিদের অনুসন্ধান করছেন। সে-কাজে তিনি মামাবাবুর সাহায্য চান।

আমি হাত থেকে বই রেখে উঠে বসলাম।

কিন্তু যাতায়াতে অনেক টাকার ধাক্কা।

তারও একটা সুরাহা হাইনে করেছেন। তিনি ব্যবস্থা করেছেন যে ডক্টর ঘোষ–মানে মামাবাবু আফ্রিকায় গিয়ে কয়েকটা বিশ্ববিদ্যালয় এবং গবেষণাকেন্দ্রে বক্তৃতা করবেন। তাতে কিছু টাকা পাওয়া যাবে। হিসেব করে দেখেছি ওতে আমাদের তিনজনের এক পিঠের ভাড়া কুলিয়ে যাবে। সুতরাং তোর খরচ হচ্ছে সিঙ্গল ফেয়ার, ডবল জানি। আর থাকা-খাওয়া ফ্রি, কারণ ওখানে তুই হবি মামাবাবুর অর্থাৎ হাইনের গেস্ট।

প্রস্তাবটি অতি লোভনীয় সন্দেহ নেই। মামাবাবু অর্থাৎ বিখ্যাত প্রাণিবিজ্ঞানী প্রোফেসর নবগোপাল ঘোষ এবং তার ভাগনে আমার বাল্যবন্ধু সুনন্দর সঙ্গে আমি দেশ-বিদেশে অনেক জায়গায় ঘুরেছি। মনে কর্তব্য স্থির করে ফেললাম, কিন্তু বাইরে কোনো উচ্ছ্বাস প্রকাশ না করে একটু ভুরু কুঁচকে বললাম, আচ্ছা, ভেবে দেখি।

পরদিন সকালে বাড়িতে ঘোষণা করলাম, এবার পুজোয় আমি একটু বাইরে যাচ্ছি। আফ্রিকা। সুনন্দের সঙ্গে।

তারপর টেলিফোনটা তুলে নিয়ে সুনন্দর নম্বরটা ডায়াল করলাম।

.

মুঙ্গু

০১.

পূর্ব আফ্রিকার টাঙ্গানিকা প্রদেশের প্রধান বন্দর হল ডার-এস-সালাম। অনেক কালের শহর। শহরের কিছু কিছু অংশে যেমন আদ্যিকালের নোংরা গলিখুঁজি, পুরনো আমলের ঘর-বাড়ি রয়েছে, তেমনি অন্যান্য অংশে গড়ে উঠেছে অতি আধুনিক অট্টালিকা, হোটেল, আলো ঝলমল রাজপথ, দোকানপাট।

মিউজিয়ামটি শহরের বাইরে। নগর-বন্দরের কোলাহল থেকে দূরে। প্রায় চার-একর জমি উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। ভিতরে বড় বড় গাছ ও বাগান। মাঝখানে মিউজিয়ামের বাড়ি।মিউজিয়াম মানে লম্বা লম্বা পাঁচ-ছটা একতলা হলঘর। কম্পাউন্ডের একপ্রান্তে ডক্টর হাইনের বাংলো প্যাটার্নের কোয়ার্টার। একজনের পক্ষে যথেষ্ট বড়। তারই একাংশ তিনি আমাদের জন্য ছেড়ে দিলেন।

ডক্টর হাইনের সঙ্গে পরিচিত হয়ে আশ্বস্ত হলাম। ভয় ছিল অমন ঘোরতর পণ্ডিত ব্যক্তি, কে জানে যদি গোমড়ামুখো বদমেজাজী হন! মামাবাবুর খাতিরে মুখে কিছু না। বললেও হয়তো আমার মতো এক উটকো ছোকরার আগমন মোটেই সুনজরে দেখবেন না। সুনন্দ না হয় প্রাণিবিজ্ঞানের ছাত্র, কিন্তু আমি তো এ-লাইনে স্রেফ মুখ। মিউজিয়াম ঝাট দেওয়া ছাড়া আমার দ্বারা তাদের কোনো উপকার হবে না।

কিন্তু দেখলাম, এ এক যুবক বৃদ্ধ।

মাঝারি লম্বা। দাড়ি-গোঁফ কামানো গোল মুখখানা ভারি হাসিখুশি। মাথায় চুল আর টাক সমান সমান জায়গা অধিকার করেছে। একটু ব্যস্ত মানুষ। প্রচুর এনার্জি। হন্ হন্ করে চলেন। লাফ দিয়ে টপকে টপকে সিঁড়ি ভাঙেন। যখন তখন দরাজ গলায় হো-হো করে কী হাসি! ভদ্রলোক বেশ ইংরেজি জানেন, কাজেই কথা বলতে অসুবিধা নেই।

প্রথম আলাপেই আনন্দের আতিশয্যে হ্যাল্লো বলে আমার পিঠ এমন চাপড়ে দিলেন যে বেশ কিছুক্ষণ ব্যথা ছিল।

মিউজিয়ামের ইতিহাস শুনলাম।

মিউজিয়ামটি ছিল এক লক্ষপতি জর্মন কফিবাগিচার মালিকের। জীবজন্তুর স্পেসিমেন সংগ্রহ করা ছিল ফন স্লীমান-এর নেশা। বহু কষ্টে ও অর্থব্যয়ে বিশাল আফ্রিকা মহাদেশের দূর দূর প্রান্ত থেকে তিনি হাজার হাজার জীবজন্তুর মৃতদেহ জোগাড় করে এনে মিউজিয়াম তৈরি করেন। এছাড়াও আফ্রিকার আরও অনেক বিচিত্র দুর্লভ জিনিস তিনি জোগাড় করেছিলেন। বছর পাঁচেক হল স্লীমান মারা গেছেন। উইলে তিনি তার সাধের মিউজিয়াম ও তৎসংলগ্ন বাড়িঘর বাগান সরকারকে দান করে যান। তারপর থেকে মিউজিয়ামটি তালাবন্ধ অবস্থাতেই পড়ে ছিল। তেমন যোগ্য কাউকে পাওয়া যায়নি মিউজিয়ামের ভার দেবার মতো। এমন সময় মাত্র কয়েক মাস ডক্টর হাইনে টাঙ্গানিকায় আসেন নিজের গবেষণার কাজে। ডক্টর হাইনে শুধু বিখ্যাত প্রাণিবিজ্ঞানী নন, মিউজিয়াম পরিচালনার কাজেও তার প্রচুর অভিজ্ঞতা। টাঙ্গানিকা সরকার এমন সুযোগ হাতছাড়া করেনি। সঙ্গে সঙ্গে ডক্টর হাইনেকে অনুরোধ জানানো হয় অন্তত কিছুদিনের জন্য মিউজিয়ামটির দায়িত্ব। নিতে। মিউজিয়ামকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সাজিয়ে গুছিয়ে আরও বড় করে দিতে।

ডক্টর হাইনে রাজি হয়ে গেলেন। ভাবলেন মন্দ নয়। পরের পয়সায় একটা ভালো আস্তানা হবে। মিউজিয়ামের কাজের ফাঁকে ফাঁকে নিজের গবেষণাও চালিয়ে যেতে পারবেন। এখনো অবশ্য আসল কাজ কিছুই এগোয়নি। বাগান পরিষ্কার, ঘর-দোরের ধুলো ঝাড়তেই সময় কেটে গেছে।

মিউজিয়ামে ঢুকেই প্রথমে নজরে পড়ল দরজার দুপাশে দাঁড় করানো দুটি প্রকাণ্ড হাতির দাঁত। হাইনে বললেন, প্রত্যেকটা দাঁত লম্বায় ন-ফুটেরও বেশি এবং ওজন দুশো পাউন্ডের ওপর। ঘরগুলোর মধ্যে টেবিল, টুল এবং বড় বড় কাঁচ-ঢাকা শো-কেসে অজস্র জন্তু-জানোয়ার, পাখি, কীট-পতঙ্গের মৃতদেহ। জন্তু ও পাখিগুলির মধ্যে খড়কুটো কাঠের গুঁড়ো ভরে স্টাফ করা। নানা ভঙ্গিতে সাজানো। দেখলে মনে হয় জীবন্ত। ফর্মালিন ভর্তি বড় বড় কাঁচের বয়ামে ডোবানো পোকা-মাকড়, সাপ। শো-কেসে পিচবোর্ডের গায়ে পিন। আঁটা রকমারি প্রজাপতি, ফড়িং ইত্যাদি। এদের মধ্যে বেশিরভাগ প্রাণী আমি কলকাতার মিউজিয়ামে দেখেছি। তবে সীমানের মিউজিয়ামের এক বিশেষত্ব আছে। ফন সীমান যেনতেন প্রকারে একটা স্পেসিমেন সংগ্রহ করার পক্ষপাতী ছিলেন না। তার আকাঙ্ক্ষা ছিল এই মিউজিয়ামের প্রতিটি সংগ্রহ হবে একেবারে সেরা।

আমি ও সুনন্দ যখন তৃতীয় হলঘরটায় ঢুকেছি, মামাবাবু ও ডক্টর হাইনে কিন্তু তখনো প্রথম ঘরটাই শেষ করে উঠতে পারেননি। প্রতিটি স্পেসিমেনের খুঁটিনাটি নিয়ে দুজনে আলোচনা করছেন, মাঝে মাঝে তর্ক হচ্ছে।

মিউজিয়ামের একেবারে শেষ ঘরটায় কোনো জীবজন্তু নেই। নানা ধরনের জিনিসে ঘর ভর্তি। বিভিন্ন উপজাতিদের পোশাক, অস্ত্রশস্ত্র, মুখোশ। কতকগুলো বিচিত্র কাঠ ও পাথরের মূর্তি। অদ্ভুত তাদের চেহারা, আশ্চর্য খোদাই কাজ।

ছোট এক শো-কেসের মধ্যে দেখি একটা প্রকাণ্ড ডিম। বাসরে কী পেল্লায়! অস্ট্রিচের ডিমের অন্তত সাত-আট গুণ বড়। সঙ্গে রাখা কার্ডে লেখা–ফসিল্ড এগ। এলিফ্যান্ট বার্ড। আঙুলে টোকা দিয়ে দেখলাম শক্ত পাথর। কেবলমাত্র মাদাগাস্কারে এই পাখির হাড় ও ডিম ফসিল অবস্থায় পাওয়া গেছে।

আপাতত মামাবাবু লেগে গেলেন ডক্টর হাইনের সঙ্গে মিউজিয়ামের স্পেসিমেনের ক্যাটালগিং করতে। দিন চারেক পরে মামাবাবু লেকচার-ট্যুরে বেরোবেন। এখানে বলে রাখি, মামাবাবুর বক্তৃতার বিষয় হচ্ছে মিসিং লিঙ্ক বা হারানো সূত্র। মানুষের পূর্বপুরুষ যে বাঁদর একথা সকলেই জানে। কিন্তু বাঁদর আর মানুষের মাঝখানে যে একটা নর-বানর অবস্থা, সেটার কোনো হদিস আজ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। এটাকে তাই বলা হয় মিসিং লিঙ্ক। অবিশ্যি মামাবাবু যে মিসিং লিঙ্ক নিয়ে বক্তৃতা দেবেন, সেটা কিন্তু মানুষের ব্যাপার নয়। সেটা পাখির ব্যাপার। পাখি এসেছে সরীসৃপ থেকে! সবচেয়ে পুরনো যে পাখির ফসিল পাওয়া যায়, তাকে বলে আর্কিয়পটেরিক্স। এই পাখিতে সরীসৃপের কিছু কিছু লক্ষণ দেখা যায়। কিন্তু মামাবাবুর ধারণা, এর চেয়েও প্রাচীন পাখি নিশ্চয়ই ছিল, যেটাকে বলা যেতে পারে সরীসৃপ আর পাখির ঠিক মাঝামাঝি অবস্থা। এটাই পাখির মিসিং লিঙ্ক–আর এটার কোনো নমুনা বা ফসিল আজ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি।

ছ-সাত দিন লাগবে মামাবাবুর বক্তৃতা শেষ করতে। তারপর আমরা টাঙ্গানিকার একটা বিশেষ জায়গায় গিয়ে ক্যাম্প ফেলব। ডক্টর হাইনে সেখানে নাকি একটি অতি প্রাচীন গুহার সন্ধান পেয়েছেন। তাতে নাকি প্রাগৈতিহাসিক মানুষের কিছু কিছু চিহ্ন তিনি দেখেছেন। কাজেই সেখানে খোঁড়াখুঁড়ি হবে, আদিম পৃথিবীর মানবজাতির ইতিহাস আবিষ্কারের চেষ্টা চলবে।

আমি এই সুযোগে ডার-এর-সালাম ভালো করে ঘুরে দেখে ফেললাম। মাঝে মধ্যে সনন্দ মামাবাবুর সাকরেদিতে ফাঁকি দিয়ে সঙ্গে জোটে। আমাদের গাইড হচ্ছে ডক্টর হাইনের অ্যাসিস্ট্যান্ট-সাড়ে ছফুট লম্বা কাফ্রি যুবক ওকেলো।

মাঝারি শহর। জাহাজঘাটায় অগুন্তি নৌকো, লঞ্চ ও ছোট-বড় জাহাজ সর্বদা গিসগিস করছে। শহরে পাঁচমিশেলি জাতের ভিড়। আফ্রিকান ছাড়াও এখানে কিছু ইউরোপীয় এবং বহু ভারতীয় ও আরবদেশীয় লোকের বাস। বাঙালি অতি অল্প। ব্যবসা বা খেতখামার করে তারা অনেকেই পূর্ব আফ্রিকায় কয়েক পুরুষ ধরে বাস করছে। পূর্ব আফ্রিকার অন্যান্য জায়গার মতো এখানকার প্রধান ভাষা সোয়াহিলি। কিন্তু অধিকাংশ শিক্ষিত লোকেই অল্প-বিস্তর ইংরেজি জানে।

আসার আগে আমি ও সুনন্দ মামাবাবুর কাছে সোয়াহিলি ভাষায় কিছুটা তালিম নিয়েছিলাম। ভাষাটা আরও রপ্ত করতে আপাতত ওকেলোকে পাকড়ালাম। আমরা

ওকেলোর সঙ্গে সমস্ত বাক্যালাপ চালাতে লাগলাম সোয়াহিলিতে। সেই দুর্বোধ্য সোয়াহিলি শুনতে শুনতে বেচারা ভালোমানুষ একেবোর প্রাণ ওষ্ঠাগত। অর্ধেক মর্ম উদ্ধার করতে পারে না। ক্রমাগত ভুল শুনে তার নিজেরই মাতৃভাষা গুলিয়ে যেতে লাগল।

.

০২.

আরও দুদিন কেটেছে।

আমরা প্রত্যেকদিন ডক্টর হাইনের সঙ্গে সকালবেলা একটা ঝাকড়া বাদামগাছের নিচে চেয়ার-টেবিল পেতে প্রাতরাশ করি। তৃতীয় দিন চায়ের আসরে যোগ দিতে গিয়ে দেখি একজন অপরিচিত ব্যক্তি বসে হাইনের সঙ্গে গল্প করছেন।

হাইনে বললেন, আসুন আলাপ করিয়ে দিই–ইনি হচ্ছেন–

আগন্তুক তড়াক করে লাফিয়ে উঠে ইয়া চওড়া একখানা পাঞ্জা বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, আমার নাম উইলিয়াম হার্ডি।

না না, বলুন ডেয়ারিং বিল। যে নামে আপনাকে সারা পূর্ব আফ্রিকা চেনে—হাইনে বললেন।

উইলিয়াম হার্ডি ওরফে ডেয়ারিং বিল, অট্টহাসিতে ফেটে পড়লেন, তা বটে, তা বটে, ও-নামটা বড্ড চালু হয়ে গেছে। আসল নামটা বোধহয় ভুলেই গেছে লোকে।

হাইনে বললেন, মিস্টার হার্ডি একজন বিখ্যাত শিকারী। দেশ-স্কটল্যান্ড। তবে আফ্রিকাতেই স্থায়ীভাবে আড্ডা গেড়েছেন। বোধহয় আর দেশে ফেরার ইচ্ছেও নেই। কী বলেন—মিস্টার হার্ডি?

ডেয়ারিং বিলের ঠোঁটের কোণে একটা পাইপ কামড়ানো ছিল। পাইপটা হাতে নিয়ে বললেন, রাইট! ত্রিশ বছর আফ্রিকায় আছি। বনে বনে ঘুরে জংলি বনে গেছি। এখন আপনাদের সভ্য জগতে ফিরে গিয়ে আর খাপ খাওয়াতে পারব না। তাই এখানেই থেকে গেছি। ভালোবেসে ফেলেছি দেশটা। আমি একা মানুষ। কেনিয়ায় নাইভাসা হ্রদের কাছে। একটি ছোট্ট কুটির বানিয়ে বাস করছি। আজকাল অবশ্য শিকার ছেড়ে দিয়েছি। নেহাৎ প্রয়োজন না হলে রাইফেল ধরি না। অনেকদিন ঘুরেছি কিনা, তাই পা দুটোকে রেস্ট দিচ্ছি। বাড়িতে বসে খাই-দাই বই পড়ি। আত্মজীবনী লিখি। আর কুটিরের বারান্দায় বসে বসে দেখি আফ্রিকার রহস্যময় প্রকৃতি। হ্রদের নীল জল। দূরে পাহাড়-জঙ্গলের রেখা। অজস্র জীবজন্তু, পাখি। আর নমাসে ছমাসে দরকার পড়লে শহরে আসি। দিব্যি কাটছে।

ডেয়ারিং বিল-এর চেহারা রোদে-জলে পোড় খাওয়া দীর্ঘ পাকা বাঁশের মতো; বয়স ধরা যায় না। মুখের দিকে তাকালে প্রথমেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে ঘন ভুরুর নিচে একজোড়া উজ্জ্বল নীল চোখ। দৃঢ় চোয়াল। উন্নত নাসা। মাথায় কোকড়া চুল, রগের কাছে সামান্য পাক ধরেছে।

মিউজিয়ামের অনেক সংগ্রহ বিলের পূর্বপরিচিত। স্পেসিমেনগুলি সংগ্রহের ইতিহাস তিনি বলতে থাকেন।

শেষ ঘরটায় ঢুকে সেই বিচিত্রদর্শন মূর্তিগুলোর সামনে বিল স্তব্ধ হয়ে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন। ঘন ঘন পাইপ টানছেন। মুখ দেখে মনে হল যেন অতীত স্মৃতির রোমন্থনে তার মন তোলপাড় হচ্ছে। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, এই মূর্তিগুলোর পরিচয় জানেন কি?

মনে হচ্ছে আফ্রিকার নানা উপজাতির শিল্প কাজ।–হাইনে বলেন।

হ্যাঁ। তবে শুধু শিল্পকর্ম বললে ভুল হবে। এদের মধ্যে অনেকগুলি ছিল আফ্রিকার বিভিন্ন উপজাতির উপাস্য দেবতা।

তাই নাকি? আমরা নতুন আগ্রহে মূর্তিগুলোকে দেখি।

বিল বলে চলেন, স্লীমানের এই এক অদ্ভুত খেয়াল ছিল। উপজাতিদের বিগ্রহমূর্তি ছলে-বলে-কৌশলে সংগ্রহ করা। এজন্য কয়েকবার তাকে ভীষণ বিপদেও পড়তে হয়েছে। তবে হ্যাঁ, একটা মূর্তি সে জোগাড় করতে পারেনি। সেটা মিউজিয়ামে আনতে না পারার আপশোস সে কখনো ভোলেনি।

কীসের মূর্তি? প্রশ্নটা আমাদের সকলের গলা থেকে একই সময় বেরিয়ে এল।

সে এক অদ্ভুত বিগ্রহ। আমার এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা। পাইপে তামাক টানতে টানতে বিল বলেন, প্রায় সতেরো-আঠারো বছর আগেকার কথা। একবার ঘুরতে ঘুরতে আমি টাঙ্গানিকার দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে উপকূলের কাছাকাছি এক উপজাতির গ্রামে গিয়ে হাজির হই। পৌঁছলাম যখন বিকেল। সেদিন গ্রামে কোনো উৎসবের আয়োজন হচ্ছিল। মস্ত অগ্নিকুণ্ড জ্বালাবার জোগাড়যন্ত্র চলেছে। গ্রামের সব মেয়ে-পুরুষ জড়ো হচ্ছে চারপাশে। একটু পরেই আরম্ভ হবে উৎসব। আমার একজন সঙ্গী ছিল। সেও আফ্রিকান, কিন্তু ভিন্ন উপজাতির লোক। আমরা দুজনেই বেজায় ক্লান্ত। ইচ্ছে ছিল রাতটা ওখানে আগুনের পাশে বসে নাচ-গান দেখে কাটিয়ে দিই। কিন্তু ভাগ্য খারাপ। একটা ঢ্যাঙা মতো লোক, বোধহয় তাদের উইচ-ডক্টর–আমাদের বলল চলে যেতে। উৎসবের সময় তাদের বিগ্রহ উন্মোচিত করা হবে। সেই পূণ্য দেবমূর্তি দর্শন করা নাকি কোনো বিদেশির পক্ষে নিষিদ্ধ। স্বাভাবিক কৌতূহলবশে সেই দেবমূর্তির সন্ধানে চারদিকে চাইতে দেখি যেখানে অগ্নিকুণ্ড তৈরি হচ্ছে সেখানে কাঠের গাদার পাশে বেদির ওপর একখানা চৌকো বড়

পাথর শোয়ানো। চামড়া দিয়ে ঢাকা। ঐ পাথরের গায়েই নিশ্চয় কোনো মূর্তি খোদাই করা আছে।

যাহোক বাধ্য হয়ে তখন আমরা বিদায় নিলাম। আমার মনে কিন্তু কৌতূহল চাড়া দিয়ে উঠল। মূর্তিটা দেখতে কেমন? গ্রামবাসীদের চোখের সামনে দিয়ে, তাদের দেখিয়ে দেখিয়ে ঘাসবনের পথ বেয়ে অনেকখানি সোজা গিয়ে আমরা জঙ্গলে প্রবেশ করলাম। তারপর রাত্রি নামে অন্ধকার ঘন হয়। আমি আমার সঙ্গীকে অপেক্ষা করতে বলে ফের গ্রামের পথে ফিরলাম।

দূর থেকে সমবেত কণ্ঠের হুঙ্কার আর ঢাকের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছিল। ঘাসবন আর ঝোঁপঝাড়ের আড়ালে লুকিয়ে লুকিয়ে আমি গ্রামের কাছে এসে উপস্থিত হলাম। একটা ঝোঁপের আড়ালে গোপনে বসে দেখলাম–প্রকাণ্ড অগ্নিকুণ্ড জ্বলছে। আগুনের একধারে আরম্ভ হয়েছে উন্মত্ত নাচ। বড় বড় ঢাক বাজছে। আর অগ্নিকুণ্ডের পাশেই সেই বেদির গায়ে চৌকো পাথরের খণ্ডটা ঠেস দিয়ে দাঁড় করানো। পাথরের গায়ে আঁকা মূর্তিটা ভালো করে দেখতে বায়নোকুলার চোখে লাগালাম।

যে অদ্ভুত দৃশ্য দেখলাম তা জীবনে ভুলব না।

হাত দেড়েক লম্বা, হাতখানেক চওড়া, ইঞ্চি চারেক পুরু একটা কালচে পাথরের খণ্ডের গা কেটে এক কিম্ভুত কঙ্কাল আকৃতির রূপ দেওয়া হয়েছে। মূর্তির রঙ কিন্তু কালো নয়।

হালকা হলুদ রং করা। আফ্রিকার আনাচে-কানাচে বহু দুর্গম জায়গায় আমি ঘুরেছি। বহু উপজাতির গ্রামে গেছি, তাদের বিগ্রহ দেখেছি। কিন্তু এমন অদ্ভুতদর্শন ভাস্কর্য কোথাও চোখে পড়েনি।

মামাবাবু হঠাৎ প্রশ্ন করেন, ওরকম কালচে রঙের পাথর ওরা পেল কোথায়? কাছাকাছি কোথাও ছিল নাকি?

হ্যাঁ। কাছে এক উপত্যকায় ঐরকম পাথর আমি দেখেছি। বোধহয় সেখান থেকেই পাথরের খণ্ডটা ওরা জোগাড় করে।

তারপর? তারপর কী হল? আমি ও সুনন্দ অধীর হয়ে পড়ি।

হ্যাঁ, তারপর ঘণ্টাখানেক ধরে গোপনে তাদের উৎসব এবং দেবতাকে দেখে আমি নিঃশব্দে ফিরে গেলাম।

এই কাহিনি হয়তো এখানেই ইতি হত, কিন্তু গোলমাল পাকালো স্লীমান। এ-ঘটনার চার মাস পরে তার সঙ্গে আমার দেখা। সেই অদ্ভুত বিগ্রহের গল্প শুনে সে ক্ষেপে উঠল, ঐ মূর্তি তার চাই।

এ-ব্যাপারে আমার মোটেই উৎসাহ ছিল না। জানতাম ও-মূর্তি জোগাড় করা রীতিমতো দুঃসাহসিক কাজ। কেন মিছিমিছি ঝাটে জড়িয়ে পড়ি। কিন্তু স্লীমানের জেদ চেপে গেছে। তার অনুরোধে বাধ্য হয়ে তাকে সঙ্গে নিয়ে আবার সেই গ্রামের উদ্দেশে রওনা দিলাম।

গ্রামে পৌঁছে আমরা স্তম্ভিত। কুটিরগুলো ভাঙাচোরা; জনমানবশূন্য। যেন একটা প্রলয় ঘটে গেছে ইতিমধ্যে। অনেক খুঁজে কয়েকজনকে আবিষ্কার করলাম–সবাই অথর্ব বৃদ্ধ-বৃদ্ধা। জানলাম পাশের এক উপজাতির সঙ্গে তাদের শত্রুতা ছিল। তারাই অতর্কিতে আক্রমণ করে গ্রাম ধ্বংস করে দিয়েছে। অনেকে নিহত বা বন্দী হয়েছে। বাকিরা। পালিয়েছে। তাদের বিগ্রহের ভাগ্যে কী ঘটেছে তারা জানে না।

গেলাম সেই আক্রমণকারী উপজাতির গ্রামে।

তারাও মূর্তিটার কোনো খবর বলতে পারল না। খুব সম্ভব যারা পালিয়েছে তারাই সঙ্গে নিয়ে গেছে।

মুর্তিটা সংগ্রহ করতে না পারায় স্লীমান অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়েছিল। আমি কিন্তু মনে মনে খুশি হই। চাইলে কেউ তাদের দেবতাকে দেবে না। অর্থাৎ চুরি করতে হত এবং নির্ঘাত এক ফ্যাসাদ বাধত। তাছাড়া বিগ্রহ চুরি ব্যাপারটা আমি ঠিক পছন্দ করতাম না, যদিও পাল্লায় পড়ে দু-একবার করেছি।

ডেয়ারিং বিল সেদিন আমাদের সঙ্গে লাঞ্চ খেলেন।

প্রচুর রকমারি সুস্বাদু খাদ্যবস্তুর আয়োজন করা হয়েছিল। বিল পরম তৃপ্তিভরে খাওয়া শেষ করে বললেন, আঃ! দারুণ খাওয়ালেন। জংলি মানুষ, মাঝে মাঝে শহরে এলে গণ্ডেপিণ্ডে গিলে যাই। স্লীমানের কাছে যখন আসতাম সেও আমাকে ভূরিভোজ করাত। তার প্রতিদানে আমি প্রত্যেকবার তার মিউজিয়ামের জন্য কিছু-না-কিছু নিয়ে এসেছি।

বটে! তাহলে আমাদের বেলা শূন্য হাত কেন? ডক্টর হাইনে হেসে বললেন। কী দোষ করলাম আমরা। আমাদের নেমন্তন্নটা বুঝি হেয়? স্লীমানের স্ট্যান্ডার্ডে হয়নি?

আরে না না, কী যে বলেন! বিল প্রবল প্রতিবাদ করে। সত্যি চমৎকার হয়েছে রান্নাগুলো। তারপর একটু দুষ্টুমির হাসি হেসে বললেন, তাছাড়া আপনাদের জন্য যে খালি হাতে এসেছি জানলেন কী করে? একটা খবর আছে। তবে জানি না আপনাদের কতটা কাজে লাগবে।

কী খবর? বলুন শিগগির।

দেখুন, আমি পূর্ব উপকূলের কাছে মাফিয়া দ্বীপ থেকে আসছি। একটা কাজে গিয়েছিলাম। সেখানে কয়েকজন গ্রামবাসী রাস্তা তৈরির জন্য খুঁড়তে খুঁড়তে কয়েকটা অদ্ভুত আকৃতির পাথর পায়। দৈবাৎ আমি তখন সেখানে ছিলাম। পাথর কটা দেখে

আমার সন্দেহ হয় এগুলো সাধারণ পাথর নয়, ফসিল। কোনো আদিম বিশাল জন্তুর হাড় জমে পাথর হয়ে গেছে। আমি গ্রামের লোকদের বলে-কয়ে রাজি করিয়েছি যেন তারা। পাথরগুলো যত্ন করে রেখে দেয়। আর খোঁড়াখুঁড়ি কিছুদিনের জন্য বন্ধ রাখে। আমি গিয়ে বিশেষজ্ঞদের এ-বিষয়ে বলছি। তারা এসে পরীক্ষা করে দেখুক।

ডক্টর হাইনে উত্তেজিত স্বরে বললেন, আপনি তো মশায় বেশ! এমন দামি খবরটা এতক্ষণ স্রেফ চেপে রেখেছিলেন!

বিল বললেন, আমি তো এ-ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ নই। ওগুলোর কোনো মূল্য আছে। কিনা কে জানে! আমার ভুল হতে পারে। তাই এসেই দুম করে ফসিলের খবর ঘোষণা করতে সংকোচ হচ্ছিল।

তারপর হাসতে হাসতে বললেন, খবরটা শুনেই আপনারা যেরকম ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন সকালে বললে কী আর দুপুর অবধি আমার সঙ্গে গল্পগুজব করে কাটাতেন! ব্রেকফাস্ট খাইয়েই হয়তো বিদেয় দিতেন। তা যাক, কয়েক ঘন্টা সময় নষ্টে কোনো ক্ষতি হবে না। ঠিকানা দিচ্ছি, যত তাড়াতাড়ি পারেন চলে যান।

উইলিয়াম হার্ডি আমাদের কাছ থেকে বিদায় গ্রহণ করলেন। যাবার আগে বলে গেলেন, আপনারা সার্ভেতে বেরিয়ে যদি কেনিয়া যান, দীনের কুটিরে একবার পদার্পণ করবেন।

ডক্টর হাইনে পরদিন মাফিয়া দ্বীপের উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন। আর তার পরের দিন মামাবাবু বেরলেন লেকচার-টুরে। ব্যস, আমি সুনন্দ তখন বাঁধন-ছাড়া মুক্ত জীব। হাইনের জিপগাড়িটা চালিয়ে আমরা শহরের বাইরে লম্বা লম্বা পাড়ি জমাতে লাগলাম। ওকেলোকে বললাম, রাখো তোমার মিউজিয়াম। তোমার বস্ ফিরে এলে যত ইচ্ছে ডিউটি কোরো। আপাতত আমাদের ক-দিন আফ্রিকা দেখাও। একটু গাই-ই করে সে রাজি হয়ে গেল।

শহর ছাড়িয়ে অনেকখানি গেলে আরম্ভ হয় পথের দু-পাশে দিগন্তবিস্তৃত তৃণভূমি। সেখানে অজস্র তৃণভোজী জন্তু দলে দলে চরে বেড়ায় নানা জাতের হরিণ, লম্বা গলা জিরাফ, সাদা-কালো জার্সি আঁটা জেব্রারা। অস্ট্রিচদের কৌতূহল বেশি। অন্য জন্তুদের মতো গাড়ির আওয়াজে দূরে সরে যায় না। গলা বাড়িয়ে চোখ পাকিয়ে দেখে–এমন বদখৎ শব্দ করতে করতে আসছে, কে হে বটে?

একদিন দূরে কয়েকটা বুনো মোষ দেখেছিলাম। ওকেলো কাছে যেতে বারণ করল। বড় বদমেজাজী প্রাণী। তবে সিংহ দেখা হল না। ওকেলে বলল, সেরেনগেটি রিজার্ভ ফরেস্টে যাও, যত খুশি সিংহ দেখবে। একেবারে পোষমানা হয়ে গেছে! মানুষ দেখলে কেয়ার করে না। সেরেনগেটি অনেক দূরে, ঠিক হল মামাবাবু ফিরে এলে যাব।

কটা দিন তোফা কাটল। সারাদিন টো-টো করি; সন্ধেবেলা বাড়ি এসে রাঁধনে ইসমাইলের অমৃত সমান গরম খানা। তারপর টেনে ঘুম।

.

০৩.

মামাবাবু ডার-এস-সালাম ফিরলেন ছ-দিন পরে। আমি ও সুনন্দ তখন বারান্দায় বসে।

ট্যাক্সি থেকে নেমে মামাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, সব ভালো তো? উঃ, খুব ঘুরেছি। একেবারে হারিকেন টুর। তারপর ডক্টর হাইনের খবর কী? ফিরেছেন?

না। সুনন্দ জবাব দেয়।

কোনো চিঠিপত্র?

কয়েকটা চিঠি আছে আপনার নামে। একটা এসেছে মাফিয়া থেকে, হয়তো হাইনের চিঠি।

বেশ চল, দেখছি।

জিনিসপত্র রেখে হাত-মুখ ধুয়ে, পোশাক পাল্টে মামাবাবু খাবার ঘরে ঢুকে হাঁক দিলেন, ইসমাইল, এককাপ গরম কফি দাও। বড্ড টায়ার্ড।

সুনন্দ তাকে তিনটে চিঠি দিল।

একটা খাম বেছে তুলে নিয়ে মামাবাবু বললেন, হ্যাঁ, এই তো ঠিকানায় দেখছি হাইনের হাতের লেখা। অন্য দুটি চিঠিতে একবার দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিয়ে তিনি খামটা খুললেন।

চিঠি জর্মন ভাষায় লেখা। মামাবাবু গভীর আগ্রহে তার পাতার ওপর ঝুঁকে পড়েন। আমরা দুজন উৎসুক চিত্তে তার মুখপানে চেয়ে থাকি।

পড়তে পড়তে হঠাৎ মামাবাবু বলে ওঠেন, বাঃ, জোর খবর দিয়েছে ডেয়ারিং বিল।

সুনন্দ তৎক্ষণাৎ প্রশ্ন করে, কী লিখেছেন হাইনে? ফসিলটা কীসের, কিছু বুঝতে পেরেছেন?

হুঁ, পেরেছেন। কোনো অতিকায় ডাইনোসরের। দাঁড়াও বলছি সব। আগে পুরোটা পড়ে নিই।

পশ্চিমের খোলা জানলাটা দিয়ে শেষ বিকেলের রশ্মি এসে ঘরে পড়েছে। বাইরে দেখা যাচ্ছে মিউজিয়ামের বাগানের একাংশ। ঘন পাতা ভরা বড় বড় ডালগুলোর ফাঁকে ফাঁকে টুকরো টুকরো গোধূলির আকাশ। মস্ত ডাইনিং রুমে আমরা তিনটি প্রাণী। মাথার ওপরে ঝোলানো বৈদ্যুতিক আলোয় মেহগনি কাঠের কালো পালিশ করা টেবিলটা চকচক করছে। সামনে বসে মামাবাবু পত্র পাঠে নিমগ্ন। উল্টোদিকে আমি ও সুনন্দ পাশাপাশি বসে। চারদিকে নিঝুম নিস্তব্ধ। শুধু রান্নাঘর থেকে টুংটাং কাপ-ডিসের আওয়াজ ভেসে আসছে।

সুনন্দ প্রস্তুত হও। মামাবাবু চিঠি থেকে মুখ তুললেন। আমরা পরশু দিন মাফিয়া রওনা দেব। ডক্টর হাইনে অনুরোধ করেছেন, আমরা যেন যত শীঘ্র সম্ভব মাফিয়া গিয়ে তার সঙ্গে কাজে যোগ দিই। পুরো ফসিলটা উদ্ধার করতে হবে।

কিন্তু কী পেয়েছেন তিনি, বললেন না তো? সুনন্দ প্রশ্ন করে। পেয়েছেন কঙ্কালের খুলি এবং আরও কতকগুলো অংশ। একটা পাজরার হাড় পেয়েছেন প্রায় আট ফুট লম্বা। দেখো আমি বলে দিচ্ছি এ নির্ঘাত ব্রাকিওসরাস। এত বড় পাজরের হাড় আর কোনো প্রাণীর হতে পারে বলে তো জানি না। যাও তুমি এখুনি। গোছগাছ শুরু করে দাও। আমি কফিটা শেষ করি আর লিস্টটা পড়ে নিই। হাইনে পাঠিয়েছেন–যাবার সময় কয়েকটা জিনিস নিয়ে যেতে হবে।

সুনন্দ পাশের ঘরে যাওয়া মাত্র আমি জিজ্ঞেস করি, ব্রাকিওসরাস কী মামাবাবু?

শুনলে তো একধরনের অতিকায় ডাইনোসর। জুরাসিক যুগের অর্থাৎ এখন থেকে প্রায় সতেরো-আঠারো কোটি বছর আগেকার সরীসৃপ। পূর্ব আফ্রিকায় ব্রাকিওসরাসের ফসিল পাওয়া গেছে।

কত বড় হতো এগুলো?

তা ধর একটা পূর্ণবয়স্ক ব্রাকিওসরাস সত্তর-আশি ফুটেরও বেশি লম্বা হত বলে অনুমান করা হয়।

আরে বাস, ওজন কত? মামাবাবুর সাড়া পেয়ে ওকেলো নিঃশব্দে এসে ঘরে ঢুকেছিল। সে বিস্ফারিত চক্ষে প্রশ্ন করে।

প্রায় পঞ্চাশ টন হত। একটা হাতির ওজন কত হবে, বলতে পার?

ওকেলো ভেবেচিন্তে বলে, ম্যাক্সিমাম ছ-সাত টন।

তবেই বুঝে দেখ এদের বপুখানা কীরকম ছিল? অনায়াসে একটা বাচ্চা হাতিকে ইনি জলযোগ করতে পারতেন। তবে সৌভাগ্যের বিষয়, ব্রাকিওসরাস হাতি-টাতি খেত না। কারণ তখনও হাতি সৃষ্টি হয়নি এবং এরা ছিল উদ্ভিদভোজী।

কেমন দেখতে ছিল? এবার আমার পালা।

আমার পড়ার টেবিলের ওপর একটা বই দেখবে লাল মলাট, বেশ মোটা, নিয়ে এসো। মামাবাবু বলেন।

বইটা খুলে পাতা জোড়া কিম্ভুত আকৃতির এক প্রাণীর ছবি খুলে ধরে বললেন, এই দেখ, ব্রাকিওসরাস। বৈজ্ঞানিকরা কঙ্কালের ওপর অনুমান করে এই চেহারা এঁকেছেন।

দেখলাম অনেকটা জিরাফের আকৃতি। লম্বা গলা, দেহের তুলনায় ছোট মাথা, মোটা লম্বা লেজ মাটিতে লুটোচ্ছে। বিরাট বপু। থামের মতো চারটে পা। সামনের পা দুটো পিছনের পায়ের চেয়ে লম্বা।

মামাবাবু বললেন, আদিম পৃথিবীতে অনেক বিশাল বিশাল প্রাণীর বাস ছিল। ডাঙার জন্তুদের মধ্যে ব্রাকিওসরাস বোধহয় ছিল সবচেয়ে বৃহৎ। এই বিরাট দেহটা নিয়ে ডাঙায় ঘোরাফেরার অসুবিধা হত বলে এরা সাধারণত জলাভূমিতে বাস করত।

কফিতে চুমুক মেরে মামাবাবু ডক্টর হাইনের লিস্টটা মেলে ধরলেন। আমার মাথায় তখনও ব্রাকিওসরাস পাক খাচ্ছে। দুম করে আর একখানা প্রশ্ন ছাড়ি, ওটা মাফিয়া দ্বীপে গেল কী করে? সাঁতরে?

লিস্ট থেকে চোখ সরিয়ে মামাবাবু বললেন, এরা অবশ্য কিছুটা সাঁতার জানত কিন্তু সাঁতারের দরকার হয়েছিল কিনা সন্দেহ আছে।

মানে?

মানে হয়তো হেঁটেই গিয়েছিল। স্রেফ চার পায়ে হেঁটে। মামাবাবু মুচকি হাসেন।

জলের ওপর দিয়ে হেঁটে যাবে কি? আমি হতভম্ব।

তখন ওখানে সমুদ্র ছিল কে বলেছে? গণ্ডোয়ানা ল্যান্ড থিওরির কথা শোননি? অনেকে মনে করেন আদিম যুগে আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, ভারতবর্ষ, অস্ট্রেলিয়া সব জুড়ে এক প্রকাণ্ড মহাদেশ ছিল। এর নাম দেওয়া হয়েছে গণ্ডোয়ানা ল্যান্ড। জুরাসিক যুগের কিছু আগে এই মহাদেশে ফাটল ধরে। কয়েকটি বড় বড় খণ্ডে ভাগ হয়ে যায় এবং ক্রমে খণ্ডগুলি পরস্পরের কাছ থেকে দূরে সরে যেতে থাকে। তাদের মাঝখানে সৃষ্টি হয় সমুদ্র। ব্যাপারটা ঘটতে বেশ সময় লেগেছিল। প্রায় দশ-বারো কোটি বছর ধরে একটু একটু করে সরে গিয়ে ভূ-খণ্ডগুলি এখনকার পজিশনে এসে দাঁড়ায়।

কোনো মানে হয় আলাদা হয়ে যাবার! আমি ক্ষুব্ধ হয়ে বলি। তাহলে আর সমুদ্র-টমুদ্রের ঝামেলা থাকত না, দিব্বি ডাঙাপথে ভারত থেকে আফ্রিকা আসা যেত।

হুঁ, জাহাজে চড়তে হত না, কত সুবিধে। হাওড়ায় ট্রেনে চড়ো, সোজা ডার-এস-সালামে এসে নামো। সুনন্দ পাশের ঘর থেকে একটি মন্তব্য ছাড়ে।

তার লক্ষ্যস্থল আমি। জাহাজে আসতে একদিন আমি ঢেউয়ের দোলায় গা গুলিয়ে সামান্য অসুস্থ হয়েছিলাম। তাই এই বিদ্রূপ।

কিন্তু প্রমাণ স্যার? কী করে বুঝল লোকে এ-দেশগুলো জোড়া ছিল? ওকেলোর বিশ্বাস হয় না।

প্রমাণ অনেক আছে। তার মধ্যে একটি হচ্ছে কিছু প্রাণী ও উদ্ভিদের চিহ্ন। এমন কিছু একই জাতের বিশেষ ধরনের প্রাণী এবং উদ্ভিদের অস্তিত্ব এইসব সুদূর দেশগুলিতে পাওয়া গেছে, যাদের পক্ষে আজকের দিনের বিশাল জলপথের বাধা পেরিয়ে কিছুতেই এক দেশ থেকে অন্য দেশে যাওয়া সম্ভব নয়। এরা নিশ্চয়ই স্থলপথেই ছড়িয়ে পড়েছিল।

অস্ট্রেলিয়া আর আফ্রিকা এক মহাদেশের মধ্যে?—ওকেলোর যেন তত্ত্বটা তবুও ঠিক হৃদয়ঙ্গম হয় না।

কেন হবে না? আদিম পৃথিবীর সঙ্গে আজকের জগতের মিল কতটুকু? তাছাড়া এই ছাড়াছাড়ি হতে বড় কম দিন লাগেনি ভেবে দেখ। অবশ্য এমনও হতে পারে, তখন দেশগুলো খুব কাছাকাছি ছিল আর স্থলপথের সেতু দিয়ে তাদের পরস্পরের সঙ্গে যোগ ছিল। মোট কথা, এদের মধ্যে যে ডাঙাপথে যোগ ছিল এ-কথাটা প্রায় সব বিজ্ঞানীই মেনে নিয়েছেন।

আমরা আরও প্রশ্ন তুলতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু মামাবাবু থামিয়ে দেন, আজ আর নয়, আর একদিন হবে। অনেক কাজ বাকি।

লিস্টটা পড়তে পড়তে মামাবাবু চেঁচিয়ে ওঠেন, সুনন্দ, হাইনের কাণ্ডটা দেখ। কী একখানা অর্ডার। লিখেছেন–আসার সময় কয়েকটা ডাইনামাইটের স্টিক সঙ্গে নিয়ে আসবেন। এ জায়গায় মাটির নিচে পাথরের স্তর খুব প্রাচীন। অনেক প্রাগৈতিহাসিক যুগের নিদর্শন পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু মুশকিল হয়েছে জায়গাটা জুড়ে অনেকগুলো প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাথরের চাই পড়ে থাকায় খুঁড়তে অসুবিধা হচ্ছে। ব্লাস্টিং করে চাইগুলো ভেঙে ফেলব। ওকেলোকে বললে ডাইনামাইট জোগাড় করে এনে দেবে। অতএব বৎস ওকেলো, তোমার গুরুদেবের আদেশ তো শুনলে? এখন আজ্ঞা পালনে তৎপর হও। আমি বেরোচ্ছি, কিছু কেনাকাটা দরকার।

.

০৪.

আমরা রুফিজি নদীর মোহনায় এসে উপস্থিত হলাম। এখান থেকে একটা ধাওয়ে চেপে সমুদ্র পাড়ি দিয়ে মাফিয়া যাব। ধাও একরকম সমুদ্রগামী নৌকো। শত শত বছর ধরে এই নৌকোগুলি যাত্রী ও মালপত্র নিয়ে আফ্রিকা ও ভারতবর্ষের উপকূলে যাতায়াত করছে। মোহনায় একটি নৌকো নিয়ে ছজন আরব মাঝি আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল। পালতোলা নৌকো। আজকাল অবশ্য মোটর-ইঞ্জিন বসানো ধাওয়ের চলন হয়েছে, কিন্তু তাড়াহুড়োয় ব্যবস্থা করার ফলে কোনো মোটরলঞ্চ বা মোটর-ইঞ্জিন চালিত ধাওয়ের বন্দোবস্ত করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি।

মামাবাবু বললেন, কিছুটা সময় বেশি নেবে। এখন সকাল নটা, সন্ধের আগে পৌঁছতে পারব আশা করছি। তবে অনুকুল বাতাস পাব, তাই আরও তাড়াতাড়ি যাওয়া যেতে পারে। আমি আর সুনন্দ বেজায় খুশি। দিনটা একটু মেঘলা করেছে। কবিত্ব করতে করতে দিব্যি সমুদ্র-বিহার জমাব। মালপত্র তোলা হলে নৌকো ছেড়ে দিল।

প্রায় আধাআধি পথ পেরিয়েছি। মাঝিরা ঘন ঘন আকাশের দিকে তাকাতে লাগল। একজন বলল, হুজুর আকাশের গতিক বড় সুবিধের নয়। তুফান আসতে পারে। তারা তাড়াতাড়ি পালটা নামিয়ে ফেলল।

দেখলাম, আকাশের কোণে একখণ্ড জমাট কালো মেঘ। বাতাসের বেগও বেশ বেড়েছে।

দেখতে দেখতে ঘোর কালো মেঘে সারা আকাশ অন্ধকার করে ফেলল। তারপরই হঠাৎ হু হু করে ছুটে এল দমকা ঝড়। আরম্ভ হল বৃষ্টি। বড় বড় জলের ফোঁটা তিরের মতো গায়ে বিধতে লাগল। নিমেষে কী আশ্চর্য পট পরিবর্তন। সেই শান্ত রোমান্টিক সমুদ্র হয়ে উঠল ভয়াল উত্তাল। নীল সাগরের রঙ পাল্টে হয়ে যায় আলকাতরার মতো মসিঘন। ঘন ঘন বিদ্যুতের কশাঘাতে আকাশ যাচ্ছে চিরে। ঢেউয়ের পর ঢেউ ধেয়ে আসছে। বিশাল পর্বতপ্রমাণ। জলের ফসফরাসের অস্পষ্ট সবজে আভায় ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে ক্ষ্যাপা সমদ্রের। রূপ। প্রাণের আশঙ্কা না থাকলে এ-সৌন্দর্য মুগ্ধ হয়ে দেখতাম।

বিক্ষুব্ধ জলরাশির মধ্যে আমাদের নৌকো মোচার ভোলার মতো একবার ঢেউয়ের। চূড়ায় লাফিয়ে ওঠে, তারপরই তলিয়ে যায়। আবার ওঠে ভেসে। দিকদিশাহীনভাবে নৌকো অন্ধবেগে ছুটে চলেছে।

আমরা তিনজন পাটাতন আঁকড়ে উপুড় হয়ে শুয়ে আছি। লোনা জল ঢুকছে চোখে-মুখে। মৃত্যুর আশঙ্কায় ভগবানের নাম জপছি আর প্রতি মুহূর্তে আশঙ্কা করছি, এই বুঝি শেষ।

কিন্তু অদ্ভুত সেই মাঝিদের সাহস ও ক্ষমতা। প্রকৃতির ঐ প্রচণ্ড তাণ্ডবের মধ্যে তারা। মরণপণ লড়াই চালিয়ে চলেছে। আর্তস্বরে আল্লার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করছে আর। প্রাণপণ চেষ্টায় টাল সামলে নৌকো ভাসিয়ে রাখছে।

একটা তীব্র কাতর আর্তনাদ ঝড়ের গর্জন ছাপিয়ে কানে এল। বিদ্যুতের ক্ষণিক দীপ্তিতে দেখলাম দুজন মাঝি নেই। ঢেউয়ের ঝাঁপটা তাদের সমুদ্রগর্ভে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। বাকি চারজন তখনও নিশ্চিত মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা কষায় মত্ত। বিলীন সঙ্গী দুটির জন্য শোক প্রকাশের সময় নেই তাদের।

কতক্ষণ এইভাবে কেটেছিল খেয়াল নেই। অকস্মাৎ নৌকোর তলদেশের সঙ্গে কঠিন কোনো বস্তুর প্রচণ্ড সংঘর্ষ হল। নৌকোটা লাফিয়ে উঠল। সেই নিদারুণ ঝাঁকুনিতে আমার মুঠো গেল আলগা হয়ে। সজোরে ছিটকে পড়লাম শুন্যে। তারপর আছড়ে পড়লাম–জলে নয়, শক্ত মাটিতে। আর আঘাতের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান হারালাম।

ধীরে ধীরে চোখ মেলোম! চোখের পাতা দুটো ভীষণ ভারী, তাকাতে কষ্ট হয়। চাইতেই উজ্জ্বল আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে গেল, আবার চোখ বুজলাম।

ভাবতে চেষ্টা করি কোথায় আমি। চিন্তাটা জট পাকিয়ে যায়। মনে আবছা আবছা ভেসে ওঠে–নৌকোযাত্রা, সমুদ্র, ঝড়, সুনন্দ, মামাবাবু। ফের চোখ খুলি। টান টান করে চাই। আর দেখি কয়েকটা আবলুস-কালো মুখ আমার ওপর ঝুঁকে পড়ে চেয়ে আছে। চোখাচোখি হতেই তাদের চকচকে সাদা দন্তপাটি বিকশিত হয়। হাসছে? সভয়ে আবার আমি চক্ষু মুদি।

বুঝেছি, আমি নির্ঘাত পটোল তুলেছি। সমুদ্রগর্ভে পঞ্চত্বপ্রাপ্তি ঘটেছে। তারপর এসে উপস্থিত হয়েছি যমপুরীতে। আমার চারপাশে এরা সব যমদূত।

নাঃ, কী সব ভাবছি যা তা!

প্রাণপণ চেষ্টায় মাথাটা পরিষ্কার করতে চেষ্টা করি। একটা জলের ঝাঁপটা খেলাম মুখে। কানে আসে কতকগুলো দুর্বোধ্য আওয়াজ, মানুষের কণ্ঠস্বর। কথা বলছে।

তাড়াতাড়ি চোখ খুলি। উঠে বসতে চেষ্টা করি। সারা শরীরে অসহ্য ব্যথা। হাত-পা নাড়তে পারছি না। মাথাটা যেন বিশ-মনি পাথর। কোনোরকমে আধশোয়া অবস্থায় যতটা। সম্ভব চারপাশে চাই।

দেখলাম কোনো এক সমুদ্রসৈকতে এসে পড়েছি। আশেপাশে লম্বা লম্বা নারিকেল গাছ। সামনে নীল সাগর। অসীম জলরাশি। ঢেউগুলি একটানা নাচতে নাচতে এসে বেলাভূমিতে ভেঙে পড়ছে। মাথার ওপর প্রভাতী সূর্য। বেলা বোধহয় বেশি নয়। তবে পরিষ্কার ঝকঝকে আকাশে রোদের বেশ তেজ। আমাকে ঘিরে কয়েকজন লোক দাঁড়িয়ে। আরও প্রায় ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ জন মেয়ে-পুরুষ তটভূমিতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দাঁড়িয়ে জটলা পাকাচ্ছে। তারা সবাই কৃষ্ণকায়। পোশাক স্বল্প। পুরুষদের দেহের উর্ধ্বাঙ্গ খালি। কেবল কোমরে জড়ানো উরু অবধি লম্বা একটুকরো জানোয়ারের বা গাছের ছাল। আবার কারও গায়ে দেখলাম রঙচঙে সুতির কাপড় রয়েছে। মেয়েদের পরনেও ঐসব

জিনিস। গলার নিচ থেকে হাঁটু অবধি ঢাকা। মেয়ে-পুরুষ সবারই গায়ে নানারকমের বিচিত্র গয়নাগাঁটি। কড়ি, শঙ্খ ইত্যাদির মালা, বালা। লোহা, পিতল ইত্যাদির গয়নাও দেখলাম। অনুমান হল এরা আফ্রিকার কোনো আদিম উপজাতি।

তারা উত্তেজিত স্বরে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছিল। একটা কথা বার বার কানে এল–মাহিন্ডি, মাহিন্ডি। কথাটার মানে জানি। সোয়াহিলি ভাষায় মাহিন্ডির অর্থ ভারতীয়। পিছনে তাকিয়ে দেখি তীরভূমি ক্রমশ উঁচু হয়ে উঠেছে। স্বল্প বালুরাশির শেষে নানারকম গাছগাছালির শুরু। উদ্ভিদরাজ্য ক্রমে ঘন হয়েছে। জায়গাটা যে কোথায় কিছু বুঝতে পারলাম না। আফ্রিকার কোনো উপকুলে? কিন্তু চক্রাকার তটরেখা এবং সমুদ্রবেষ্টনী দেখে সন্দেহ হল কোনো দ্বীপ। হঠাৎ মনে পড়ল, সুনন্দ? মামাবাবু?–কই তারা! দুঃসহ আশঙ্কায় চারদিকে ব্যাকুল দৃষ্টিতে দেখি।

ঐ তো!

কতগুলো লোকের ভিড়ের মাঝে মামাবাবু শুয়ে রয়েছেন। পাশে সুনন্দ বসে। নিচু হয়ে কী জানি করছে। ডাকলাম, সুনন্দ! ক্ষীণ স্বর বেরোল।

সুনন্দ চকিতে ফেরে। কে অসিত? উঃ, বাঁচালি বাবা! এখন কেমন লাগছে? উঠিস নে, আমি যাচ্ছি।

মামাবাবুর কী হয়েছে? শুয়ে কেন? নিজের হাত-পাগুলো আস্তে আস্তে নাড়াই।

নাঃ, ভাঙে-টাঙেনি। তবে অনেক জায়গায় চোট খেয়েছে। কোনোরকমে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করি। পাশের লোকগুলো আমায় ধরে তুলে দাঁড় করিয়ে দেয়। হেঁটে সুনন্দের কাছে গিয়ে দেখি মামাবাবুর মাথায় জামা ছিঁড়ে কাপড়ের ফালির ব্যান্ডেজ বাঁধছে। মামাবাবুর চোখ বোজা, তবে নিশ্বাসের তালে বুক ওঠানামা করছে। কিছুটা স্বস্তির সঙ্গে জিজ্ঞেস করি, কেমন আছেন মামাবাবু?

সুনন্দ জবাব দেয়, ভালো। মাথায় লেগেছে। রক্ত পড়ছিল, তবে সিরিয়াস কিছু নয়।

আর তুই?

পারফেক্টলি ফিট। শুধু বাঁ হাতের কব্জিটায় একটু লেগেছে। ভগবানকে ধন্যবাদ দে, বালিতে আছড়ে পড়ায় আমরা প্রাণে বেঁচে গেছি।

একটু পরে মামাবাবু উঠে দাঁড়ালেন। খুব অবসন্ন দেখাচ্ছিল তাকে। চারিদিক তাকিয়ে বললেন, মনে হচ্ছে এটা কোনো দ্বীপ। রুফিজি নদীর মোহনার কাছে কয়েকটা ছোট ছোট জঙ্গুলে দ্বীপ আছে। ম্যাপে তাদের পয়েন্ট আউট করা হয় না। বোধহয় তাদেরই একটায় এসে পড়েছি!

সুনন্দ বলল, এখানে তো একমাত্র উপজাতি ছাড়া অন্য লোক দেখছি না! আর কোনো জাতি থাকে কিনা কে জানে!

না থাকাই সম্ভব। এই দ্বীপগুলো অস্বাস্থ্যকর বলে সাধারণত মানুষ বাস করে না।

হঠাৎ একটি লোক এসে আমাদের সামনে দাঁড়াল। দশাসই পুরুষ। পরনে একখানা লাল রঙ মাখানো পশুচর্ম। হাতে বিরাট লম্বা বর্শা। অঙ্গে নানারকম গয়নাগাটির বিশেষত্ব চোখে পড়ার মতো। বেশ ভারিক্কি চালে আমাদের মুখের দিকে তাকিয়ে সে হড়বড়িয়ে একগাদা কী সব বলে গেল। কী জানি প্রশ্ন করল। ভাষাটা চেনা, সোয়াহিলি। কিন্তু অর্থ ঠিক ধরতে পারলাম না।

মামাবাবু একটুক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে থেকে উত্তর দিলেন সোয়াহিলিতে।

সঙ্গে সঙ্গে আবার একপ্রস্থ প্রশ্নবাণ নিক্ষিপ্ত হয়।

তার দ্রুত কথা বলার জন্য এবং বিচিত্র অপরিচিত উচ্চারণভঙ্গির ফলে আমার বা সুনন্দের সামান্য সোয়াহিলি জ্ঞানে কুলোলাচ্ছিল না।

ইতিমধ্যে সমুদ্রতীরের তাবৎ মেয়ে-পুরুষ এসে আমাদের ঘিরে দাঁড়িয়েছে। আগ্রহভরে সমস্ত কথা গিলছে। তাদের গুঁতো খেয়ে আমি ও সুনন্দ অনেকটা তফাতে হটে গেলাম।

সেখান থেকেই ঘাড় উঁচু করে আমরা মামাবাবু ও সেই লোকটির কথাবার্তার সারমর্ম বুঝতে চেষ্টা করলাম। খাপছাড়াভাবে কয়েকটা কথা বুঝলেও আসল বক্তব্য কিছুই ধরতে পারছিলাম না।

মামাবাবু হাত-টাত নেড়ে বোঝাচ্ছেন। মাঝে মাঝে আঙুল তুলে সমুদ্রের দিকে। দেখাচ্ছেন। কিছুক্ষণ পর তিনি আমাদের উদ্দেশ করে বললেন, ঠিকই ধরেছি এটা দ্বীপ, উপকূলের কাছেই। এই উপজাতিরা দ্বীপের একমাত্র বাসিন্দা। ইনি হচ্ছেন সর্দার। জানতে চাইছেন আমরা কে? কেন এসেছি? কী করে এসেছি ইত্যাদি।

সুনন্দ বলে, এদের রকম-সকম কেমন বুঝছেন?

ভালোই। আপাতত আমাদের কোনো ক্ষতি করার লক্ষণ নেই। তবে বিদেশি অতিথি বিশেষ পছন্দ করে বলে মালুম হচ্ছে না।

আমি বললাম, জিজ্ঞেস করুন না এখান থেকে তীরে ফিরে যাবার কী উপায়?

হুঁ, করছি। তারপর আবার প্রশ্নোত্তর।

একটি লোক আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

লোকটা বেজায় ঢ্যাঙা। রোগা, পাকানো দড়ির মতো হাত-পা। মুখে অজস্র বলিরেখা। দেখলে বোঝা যায় প্রচুর বয়স। তার সারা গায়ে-মুখে বিচিত্র নকশা কাটা। গলায় হাড়ের টুকরো গাঁথা মালা। কোমরে জড়ানো একখানা লাল-কালো রঙ করা চামড়া। তার চোখের দিকে তাকিয়ে বুকটা শিরশির করে উঠল। বাজপাখির মতো চাউনি, তীক্ষ্ণ কুর। সর্দারের ঘাড়ের কাছে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে সে মন দিয়ে সব শুনছিল, মাঝে মাঝে দু-একটা প্রশ্ন করছিল।

খানিক পরে মামাবাবু বললেন, বলছে দ্বীপের কাছ দিয়ে নাকি কোনো নৌকো জাহাজ-টাহাজ যায় না। তবে ওরা নিজেরা মাঝেমধ্যে সমুদ্র পেরিয়ে উপকূলে যায়। তখন আমাদের সঙ্গে নিয়ে যেতে পারে। ঠিক স্পষ্ট কথা দিচ্ছে না। তবে মনে হচ্ছে। উপহার-টুপহার দিয়ে একটু সন্তুষ্ট করলে রাজি হবে। যাক, এখন চল আমাদের মাঝিদের কী অবস্থা দেখি। নৌকোটার খোঁজ করি।

চারজন মাঝিকে দেখতে পেলাম কাছেই। সৌভাগ্যবশত তারা সবাই জীবিত। তবে দুজন বেশ আহত হয়েছে। একজনের লেগেছে কোমরে, সে শুয়ে ছটফট করছে। আর একজনের ডান হাতের কনুইয়ের হাড় ভেঙেছে বা মচকেছে। বেচারা হাত চেপে ধরে বসে যন্ত্রণায় অস্ফুট কাতরোক্তি করছে। অন্য দুজন মোটামুটি অক্ষত। তারা বালির ওপর বসে। দিশাহারা ভাব। কয়েকজন দ্বীপবাসী তাদের ক্রমাগত নানারকম প্রশ্ন করে চলেছে। মাঝিরা কোনো উত্তর দিচ্ছে না। শুধু জড়োসড়ো হয়ে অসহায়ভাবে তাকিয়ে আছে। আমরা কাছে যেতেই তারা মহা খুশি হয়ে উঠে দাঁড়াল।

মামাবাবু আহত দু-জনকে পরীক্ষা করলেন। আঘাতের গুরুত্ব আপাতত কিছু বোঝা গেল না। তিনি অন্য দু-জনকে আহতদের পাশে বসে থাকতে আদেশ দিয়ে আমাদের বললেন, চল, নৌকোটা দেখি। ঐ যে পড়ে আছে। আমাদের সঙ্গে ওষুধপত্র ব্যান্ডেজ ছিল। আহত লোকগুলোর জন্য দরকার।

নৌকোটা জলের কিনারে বালির ওপর ওল্টানো অবস্থায় পড়ে ছিল। ভাঙা, দুমড়ানো। নৌকোর দিকে যেতে যেতে সুনন্দ বলল, মামাবাবু, ঐ লোকটা কে? সর্দারের পিছনে দাঁড়িয়ে ছিল। বেজায় ঢ্যাঙা।

ওর নাম কামাউ। এই উপজাতির উইম্ ডক্টর।

বুঝেছি। আমাদের দেশে যাদের বলে ওঝা।

না, আমাদের দেশের ওঝা বা গুণিনদের থেকে এদের তফাত আছে। এদের ক্ষমতা আরও বেশি। উপজাতিদের মধ্যে এরা অত্যন্ত প্রভাবশালী। এরা বহুবিদ্যাবিশারদ। একাধারে উপজাতি পল্লির হেকিম, পূজারি, সর্দারের পরামর্শদাতা, আরও অনেক কিছু।

লোকটাকে কিন্তু সুবিধের মনে হল না। সুনন্দ বলে।

হ্যাঁ। মামাবাবু চিন্তান্বিত স্বরে বললেন। যাহোক ভালোয় ভালোয় ফিরতে গেলে ওকে সন্তুষ্ট রাখতে হবে।

টেনেটুনে নৌকোটা সোজা করলাম। আমাদের মালপত্র পাটাতনের সঙ্গে শক্ত করে বাঁধা ছিল, তাই খুলে পড়ে যায়নি। এক এক করে প্যাকেটগুলো খুলে দেখতে থাকি।

হালকা ঠুনকো সমস্ত জিনিস ভেঙে গুঁড়িয়ে গেছে। তবে টিনের খাবার, জামা-কাপড়, তাঁবু, বইপত্র, ওষুধের বাক্স, স্টিলের বাসন ইত্যাদি অনেক কিছু মোটামুটি অক্ষত রয়েছে। সুনন্দ বলল, ভাগ্যিস ক্যামেরাটা আমার কাঁধে ছিল। তাই বালিতে পড়ে বেঁচে গেছে।

মামাবাবুর নজর বইয়ের দিকে। যাক বইগুলো রক্ষে পেয়েছে। অল্প ভিজেছে, কিন্তু ছেড়ে-টেড়েনি।

জিনিসগুলো বের করে পরীক্ষা করছি, এমন সময় এক কাণ্ড ঘটল। দ্বীপবাসীরা এতক্ষণ আমাদের ঘিরে দাঁড়িয়ে চোখ গোল গোল করে বিদেশিদের সম্পত্তি দর্শন করছিল। হঠাৎ একজন একটা মোজা হাতে তুলে নিল। দেখাদেখি অন্যরাও টপাটপ যে যা পারে হাতাতে শুরু করল।

মহা মুশকিল। বারণ করতে ভরসা হচ্ছিল না, কিন্তু যে রেটে হাতছাড়া হচ্ছে তাতে আমাদের সম্পত্তির আর কিছু বাকি থাকলে হয়! একজন সুনন্দের সিগারেট লাইটারটা ছোঁ মারল। ব্যস, সুনন্দের ধৈর্যচ্যুতি ঘটল। লাইটারটা সুনন্দের এক জাপানি বন্ধু তাকে প্রেজেন্ট করেছিল।

তবে রে! সে খপ করে লোকটার হাত থেকে লাইটার কেড়ে নিয়ে খচ্ করে তার মুখের সামনে আগুন জ্বালল। বলা নেই কওয়া নেই, নাকের কাছে অগ্নিশিখা লাফিয়ে উঠতে দেখে সে তত বাপরে বলে মারল পিছনে এক লম্ফ। অন্যদেরও আক্কেলগুড়ুম। ঘাবড়ে গিয়ে হুড়মুড় করে কয়েক পা হটে গেল। কয়েকজন নারী ও শিশু দিল দৌড়। জাদু, বিদেশি জাদু–মুজিমা ইয়া মাগেনি বলতে বলতে লোকগুলো মহা সোরগোল করে যে যা নিয়েছিল সব ছুঁড়ে ফেলে দিতে লাগল। সুযোগ পেয়ে মামাবাবু বোঝালেন, সাবধান, হাত দিও না, সব মন্ত্র দেওয়া আছে। ভীষণ বিপদে পড়বে।

এই ঘটনাটায় আমাদের মহা উপকার হয়েছিল। দ্বীপবাসীদের ধারণা হয়ে গেল বিদেশিদের জিনিস মন্ত্রপূত বিপজ্জনক। কখন কোনটা থেকে অগ্নিদেব ফোঁস করে উঠবেন কে জানে! ভবিষ্যতে নিজে থেকে না দিলে আমাদের জিনিসে এরা কক্ষনো হাত দেয়নি। সেধে দিতে গেলেও কি আর সহজে নেয়! অনেক করে বোঝাতে হয়েছিল, মন্ত্র-ট সরিয়ে নিয়েছি। নির্ভয়ে গ্রহণ কর বৎস।

একখানা প্লাস্টিকের থালায় দুটো রুমাল, কয়েকটা চকচকে বোতাম, একটা লাল টাই, ইত্যাদি সাজিয়ে নিয়ে আমরা সর্দারের সামনে নিবেদন করলাম–উপঢৌকন।

সর্দার হাত বাড়িয়েই টেনে নিল। আমাদের মুখপানে একটু সন্ত্রস্তভাবে তাকাল। মামাবাবু অভয় দিলেন, ভয় নেই।

সর্দার আড়ম্বর সহকারে প্রণামী গ্রহণ করলেন। মুখ দেখে মনে হল খুশি হয়েছে।

এরপর কিছু উপহার দেওয়া হল কামাউকে। উপহার সে বিনা বাক্যব্যয়ে টেকস্থ করল, কিন্তু মুখে কোনো সন্তোষ প্রকাশ করল না।

যতটা সম্ভব জিনিস বেঁধে-ঘেঁদে কাঁধে তুলে আমরা দ্বীপের মধ্যে উপজাতিদের গ্রামে যাবার জন্য প্রস্তুত হলাম। রীতিমতো শোভাযাত্রা করে আমরা বনপথ দিয়ে এগোলাম।

আহত দু-জনকে আমরা ডাল দিয়ে তৈরি স্ট্রেচারে বয়ে নিয়ে চললাম। মামাবাবু তাদের যন্ত্রণা কমানোর ওষুধ দিয়েছিলেন। যাতে নড়াচড়ায় বেশি কষ্ট না হয়।

প্রায় আধ মাইল চলে আমরা একটা খোলা জায়গায় এসে উপস্থিত হলাম। মস্ত গোল প্রাঙ্গণ। গাছ কেটে আগাছা সাফ করে পরিষ্কার সমতল করা হয়েছে। চারধারে বাঁশঝাড়ের বেড়া। চত্বরের সীমানা ঘেঁষে ছোট-বড় দশ-বারোটি কুটির। কুটিরের দেয়াল

বাঁশের ওপর কাদা লেপে তৈরি। চালে ঘাস-পাতা চাটাইয়ের ছাউনি। এই হচ্ছে আদিবাসীদের গ্রাম।

আমরা ঘাড় থেকে জিনিস নামিয়ে একটু বিশ্রাম নিলাম। তিনটে নারকেল দু-আধখানা করে ভেঙে আমাদের দেওয়া হল খেতে। চমৎকার টাটকা শাঁস। খিদের মুখে স্বাদ লাগল। যেন অমৃত।

আমাদের পৌঁছে দিয়ে পুরুষরা আবার বেরিয়ে গেল তাদের দৈনন্দিন খাদ্য সংগ্রহের ধান্দায়।

একটা ডেরা বাঁধতে হয়। আপাতত যে-কটা দিন এখানে থাকতে হবে, মাথা গোঁজার। আশ্রয় চাই। ওদের কুটিরে ওদের সঙ্গে তো আর থাকা চলে না! সুতরাং তাঁবু খাটালাম।

তবু পাতলাম চত্বরের ভিতরে নয়, গ্রাম থেকে একটু দূরে। সমুদ্রতীরের কাছে। এধারে গাছপালা তেমন ঘন নয়, কিন্তু পরে দেখেছি দ্বীপের অন্য পাশে বেশ ঘন।

আমাদের তাঁবুটা বেশ বড়। মাঝখানে একখানা ক্যানভাস ঝুলিয়ে দিতেই দুটো কামরা হয়ে গেল। একটায় থাকবেন মামাবাবু, অন্যটায় আমি ও সুনন্দ। বাকি সমস্ত দিনটা কেটে গেল ক্যাম্প খাটাতে।

মাঝিদের তাঁবুটি পড়ল আমাদের থেকে কিছু দূরে। মামাবাবু আহতদের যথাসম্ভব সেবাশুশ্রূষা করলেন। ওষুধ দিলেন। শক্ত করে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিলেন। বললেন, আশা করছি কয়েকদিন রেস্ট নিলেই ভালো হয়ে উঠবে।

দ্বীপের বালখিল্যের দল এবং অল্পবয়সী কিছু ছেলে-মেয়ে কিন্তু মুহূর্তের জন্যেও আমাদের সঙ্গ ছাড়ে নি। আমাদের রকম-সকম, তাঁবু খাটানো, জিনিস গোছানো, সব দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গভীর আগ্রহে দেখছে এবং অনর্গল বকর বকর করে নিজেদের মধ্যে আমাদের সমালোচনা করছে। তবে সর্বদাই তারা বেশ খানিকটা নিরাপদ ব্যবধান বজায় রেখেছিল–বিদেশি জাদুর ভয়ে।

সূর্য ডোবার আগে দ্বীপের সবাই ঘরে ফিরল। তাদের আহ্বানে আমরা গ্রামে গেলাম। মাঝিরা যেতে চাইল না। প্রথমত দ্বীপবাসীদের সঙ্গে মেশার কোনো আগ্রহ তাদের নেই। দ্বিতীয়ত আহত সঙ্গী দুজন রয়েছে।

দেখলাম চত্বরের মাঝখানে এক অগ্নিকুণ্ড জ্বালানো হয়েছে। সবাই জড়ো হয়েছে চারপাশে। সর্দার এবং কামাউ বসেছে দুটো উঁচু পাথরের আসনে। আগুনের আঁচে ঝলসানো হচ্ছে মাংস, মাছ। একটু পরেই বড় বড় ঢাকে পড়ল কাঠির ঘা। ধ্বনিত হয়ে উঠল আকাশ-বাতাস। তৎক্ষণাৎ একদল উঠে শুরু করল নাচ। একদল ধরল গান। ক্রমে বাজনার লয় বাড়ে, নাচের তাল দ্রুততর হয়। আগুনের লালচে আভায় সঞ্চরমান

সুগঠিত কৃষ্ণবর্ণ মূর্তিগুলি কেমন অপার্থিব বোধ হচ্ছিল। সে-ধ্বনি সুন্দর, সে-দৃশ্য কেমন ঘোর লাগায়। আমরাও মাথা নেড়ে তাল ঠুকি।

ছেলে ও মেয়ের দল পালা করে নাচল। কখনো যৌথ নৃত্য। নানারকম নাচ। জন্তু জানোয়ারের অঙ্গভঙ্গি নকল করে নাচ। উদ্দাম সমর-নৃত্য, কত কী!

দিব্যি আছে এরা। ভবিষ্যতের ভাবনা নেই। অতীতের জন্য আক্ষেপ নেই। শুধু বর্তমান। প্রত্যক্ষ জীবনধারণের তাগিদে কঠোর সংগ্রাম আর অনাবিল আনন্দ।

ঘণ্টা দুয়েক পর নাচ-গান থামল। আরম্ভ হল যথেচ্ছ পানভোজন। আমরাও এক-এক টুকরো মাংস এবং এক পাত্র মাংসের কাথ মেশানো ভুট্টার সুরুয়া পেলাম। স্যুপটা মন্দ নয়, কিন্তু আধপোড়া মাংস মুখে রুচল না। খাবার ভান করে লুকিয়ে ফেললাম।

পেটপুরে ভোজন করে সবাই টইটুম্বুর। কেউ কেউ আগুনের ধারেই সটান শুয়ে পড়ে নাসিকা গর্জন শুরু করল। কেউ কেউ উঠে গেল কুটিরে। আমরাও সুযোগ বুঝে নিঃশব্দে উঠে পড়ি।

.

০৫.

দ্বীপটাতে গুছিয়ে বসলাম।

মেয়াদ অবশ্য বেশিদিন নয়, মাত্র দশদিন। সর্দার বলেছে আমরা যেদিন দ্বীপে এসেছি তারপর ঠিক এগারো দিনের দিন ময়োজিমাকুবা অর্থাৎ পূর্ণিমা। আকাশে সেদিন মস্ত গোল চাঁদ উঠবে। পূর্ণিমার আগের দিন তাদের নৌকো যাবে ওপারে। আমাদেরও তখন সঙ্গে নিয়ে যাবে।

সূচনায় বেঘোরে প্রাণ যাবার উপক্রম হলেও পরের ব্যাপারটা মন্দ দাঁড়াচ্ছে না। বরাতে শিকে ছিঁড়ে খাসা একটা অ্যাডভেঞ্চার জুটে গেছে। দশটা দিন তো দেখতে দেখতে কেটে যাবে। অতএব প্রাণভরে এই হঠাৎ-পাওয়া রোমাঞ্চের স্বাদ উপভোগ করে নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।

আমাদের থাকার ব্যবস্থাটি ভালোই হয়েছে। আর খাওয়ার ভাবনা মামাবাবু সুনন্দের ঘাড়ে চাপিয়ে দিলেন, কারণ রান্নার ব্যাপারে সুন্দর দারুণ উৎসাহ।

ঠিক করা হল প্রথমে দ্বীপটা সার্ভে করা যাক।

সকালে একবার সপারিষদ সর্দার এসেছিল খোঁজ নিতে। আসা মাত্র সুনন্দ তাকে একটা পেন-নাইফ প্রেজেন্ট করল। ছুরিটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে সর্দার মহাখুশি। এখন তাদের

ব্যবহার বেশ সহজ, বন্ধুত্বপূর্ণও বলা যায়। শুধু ঐ কামাউ হল ব্যতিক্রম। সেও এসেছিল, কিন্তু দূরে দাঁড়িয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে চেয়ে রইল। মামাবাবু এগিয়ে তাকে নমস্কার জানালেন–জাম্বো বানা। কিন্তু তার সন্দিগ্ধ আচরণ কিছু সরল হল বলে মনে হল না। যাক বাবা মিশতে না চায় ক্ষতি নেই, কোনো বাগড়া না করলেই বাঁচোয়া।

সর্দার সুনন্দকে অনুরোধ করল, মাহিন্ডি, তোমার জাদুটা একবার দেখাও তো। সেই যে। হঠাৎ অগ্নির আবির্ভাব, ছোট্ট একখানা নীল বাক্স থেকে।

সনন্দ গেরামভারি চালে পকেট থেকে লাইটার বের করল। দেখেই জনতা সাত হাত তফাতে সরে গেল।

সুনন্দ বার কয়েক হিংটিং-ছট মন্ত্র আউড়াল, শূন্যে বহু আন্দোলিত করল, তারপর খ করে লাইটার টিপল।

মোটো, মোটো–আগুন, আগুন,ভীত বিস্মিত দর্শকদের মধ্যে থেকে কোলাহল ওঠে। বিদেশি ভারতীয়দের জাদুর মাহাত্ম নিয়ে জোর একচোট আলোচনা হয়।

এই ফাঁকে সুনন্দ আমাদের দেশে ফেরার কথাটা তোলে।

সর্দার বলল, হ্যাঁ-হ্যাঁ যাবে বইকি! তবে ক-দিন অপেক্ষা কর। আমরা যখন-তখন সমুদ্রযাত্রা করি না। ওপারের দেশ ভালো নয়। ওখানে আমাদের অনেক শত্রু। শিকো কুমি অর্থাৎ দশ দিন অপেক্ষা কর।

তাদের ভালোমতো লোভ দেখালে বা জেদাজেদি করলে হয়তো আগেই আমাদের পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা হতে পারত, কিন্তু এ নিয়ে আমরা বেশি চাপাচাপি করলাম না। ক-টা দিন এই অজানা দ্বীপে রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার আকর্ষণ কম নয়।

সর্দার দলবল নিয়ে চলে গেলে আমরাও বেরলাম। স্থির হল সমুদ্রের ধারে ধারে গোটা। দ্বীপটা চক্কর দিয়ে আসব। একজন দ্বীপবাসীকে সঙ্গে নিলাম পথ দেখাতে।

যেতে যেতে লোকটির মুখে শুনলাম এ-দ্বীপে বড় হিংস্র জন্তু নেই। বন্য বড় জন্তু বলতে আছে কেবল শুয়োর। তবে সংখ্যায় বেশি নয়। প্রায়ই তাদের শিকার করা হয় কিনা! আমাদের সঙ্গে বন্দুক-টন্দুক ছিল না, কাজেই সংবাদটা শুনে আশ্বস্ত হলাম।

লোকটি বলল, অবশ্য ছোট জানোয়ার বা সাপখোপের অভাব নেই। খটাসগুলো আকারে ছোট, কিন্তু শয়তানিতে বড় জন্তুকে হার মানায়। প্রায়ই তাদের পোষা ছাগলছানা মারে।

খটাস বা ছোট জন্তু নিয়ে আমরা মাথা ঘামালাম না। তবে কিছুদূর গিয়েই এক দৃশ্য দেখে আমাদের টনক নড়ল। বুঝলাম দুশ্চিন্তার কিছু কারণ আছে বটে।

দেখি একটি লোক বল্লমের ডগায় একটা প্রকাণ্ড মরা সাপ বিধিয়ে ঝুলিয়ে আনছে। লম্বায় সাপটা অন্তত সাত ফুট হবে। মামাবাবু দেখে বললেন, গ্রিন মাম্বা। অতি বিষাক্ত। গোখরো-কেউটের চেয়ে কোনো অংশে কম নয়।

দ্বীপের যেদিকে আমাদের তাঁবু পড়েছে, তার উল্টো দিকে গাছপালা ঘন। একটা অগভীর জলাশয় রয়েছে। চারপাশ ঘিরে নিবিড় জঙ্গল। জলাশয়ের ধারে ম্যানগ্রোভ গাছের দুর্ভেদ্য বেষ্টনী। একটু শুকনো জায়গায় বাঁশ-ঝাড় ও খাটো আকারের প্রচুর ডালপালাওলা কাঁটাঝোঁপ। ম্যানগ্রোভ বনে অসংখ্য কাঁকড়া। সন্ন্যাসী কাঁকড়া ও বীণাবাদক কঁকড়াই বেশি। পুরুষ বীণাবাদক কাকড়াগুলো ভারি মজার দেখতে। একটা দাঁড়া ছোট্ট, অন্যটা বিরাট। বড় দাঁড়াটা মুখের সামনে বাগিয়ে ধরে রাখে, যেন বীণা, আর ছোট হাতটা দিয়ে যেন বাজাচ্ছে।

মামাবাবু সন্ধানী দৃষ্টিতে চারদিকে চাইছিলেন। বললেন, এখানকার কীট-পতঙ্গ লক্ষ করো। কতকগুলো দেখছি একেবারে নতুন, অচেনা। ভালো করে সাজসরঞ্জাম নিয়ে পরে আসতে হবে। বনে ঢুকব। স্পেসিমেন নিয়ে যাব।

কয়েকটা কীট-পতঙ্গ তিনি আমাদের দেখালেনও। খটমট ল্যাটিন নাম বললেন তাদের। একবার মামাবাবু হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন, একী! আঙুল দিয়ে দেখালেন, গাছের গুঁড়িতে বসা একটা গোবদা গঙ্গাফড়িং।

ভালো করে দেখ। মাথায় দুটো শিং রয়েছে। এ-জাতের ফড়িং তো কেবল মাদাগাস্কারে পাওয়া যায় জানতাম! এখানে এল কী করে!

ধরার চেষ্টা করতেই ফড়িংটা ফড়ফড় করে উড়ে পালাল।

সমুদ্রের কিনার ঘেঁষে চলেছি। দেখলাম, আমাদের নৌকো দ্বীপের যে-পাশে আছড়ে পড়েছিল সে-ধারের সৈকতভূমিই সবচেয়ে চওড়া। অন্য সব ধারে সমুদ্রতীর অপরিসর, খানাখন্দে ভরা পাথুরে। আমাদের নৌকো তীরের এসব অংশে আঘাত করলে আর প্রাণে বাঁচতে হত না।

লক্ষ করলাম দ্বীপের চারপাশে তীরের কাছাকাছি অনেক শিলাখণ্ড ও প্রবাল প্রাচীর জলের মধ্যে থেকে মাথা তুলে রয়েছে। ঢেউ এসে সবেগে আছড়ে পড়ছে তাদের ওপর। চোখে দেখা যায় না এমনি ডুবো পাহাড় না জানি আরও কত লুকিয়ে আছে সমুদ্রগর্ভে। বোধহয় এইসব বিপজ্জনক শিলাস্তূপ ও প্রবাল প্রাচীরের ভয়েই দ্বীপের কাছ দিয়ে জাহাজ বা নৌকো চলে না। আমরা সর্বক্ষণ সমুদ্রের পানে নজর রেখেছিলাম। কিন্তু বৃথা আশা, কোনো নৌকো-চৌকো চোখে পড়ল না।

একটা আশ্চর্য জিনিস দেখলাম।

এক প্রাচীন ভগ্নস্তূপ। কেল্লা জাতীয় বাড়ি ছিল মনে হল। বড় নয়, ছোট আকারের বাড়ি তৈরি হয়েছিল আগাগোড়া পাথরে। ইটের চিহ্নমাত্র নেই। অজস্র পাথরের টুকরো চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে আছে। ছাদ ভেঙে পড়েছে, তবে দেয়ালগুলো এখনও খাড়া। বৃক্ষ, লতাগুল্মে ঢেকে ফেলেছে ভগ্নাবশেষ।

এখানে বাড়ি কে তৈরি করল? দ্বীপে সভ্য মানুষের বসতি ছিল বলে তো মনে হয়নি। তাহলে আরও বাড়িঘরের চিহ্ন চোখে পড়ত। মাত্র একটি কেন?

মামাবাবু বললেন, জলদস্যুদের আড্ডা হতে পারে। নির্জন দ্বীপে আরব বা পর্তুগিজ জলদস্যুদের গোপন ঘাঁটি ছিল।

সুনন্দ আমার কানে কানে বলল, পরে খুঁজে দেখব, যদি গুপ্তধন পাওয়া যায়।

কাজ নেই আমার গুপ্তধনে। ঐ সাপের আড্ডায় আমি ঢুকছি না।

যেতে যেতে মামাবাবু আদিবাসীটির সঙ্গে নানা বিষয়ে আলাপ করছিলেন। এই দ্বীপ ও এখানকার অধিবাসীদের খবরাখবর নিচ্ছিলেন। দ্বীপের গাছপালা পশুপাখি সম্বন্ধে তথ্য জোগাতে তার আপত্তি নেই, কিন্তু নিজেদের সম্পর্কে বেশি কথা বলতে সে নারাজ।

আশ্চর্য হয়ে দেখছিলাম, কত পাখি। জলের ধারে উড়ছে নানান সামুদ্রিক পাখি। গাছে গাছে রঙ-বেরঙা পাখির কাকলি। বাঃ-চেনা শিস, তাকিয়ে দেখি গাছের ডালে ঝুটি মাথায় বুলবুলি। ভারি আপনজন মনে হল পাখিটাকে।

একজাতের ক্ষুদে বাঁদর আমাদের দেখে মহা হল্লা জুড়ে দিল। বোধকরি শার্ট-প্যান্ট পরা মানুষ এই প্রথম দেখছে।

পুরো দ্বীপটা একপাক ঘুরে আসতে আমাদের ঘণ্টা চারেকের বেশি লাগল না।

ছোট্ট ভূখণ্ড। কোনো রকমে জলের ওপর মাথা জাগিয়ে রেখেছে। মনে হয়, যে কোনো সময় সমুদ্র তাকে গ্রাস করে ফেলতে পারে। এইটুকু সামান্য জমি এবং এখানের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের জন্যই বোধ হয় এখন পর্যন্ত সভ্য মানুষ এ-দ্বীপে বসতি স্থাপনে উদ্যোগী। হয়নি।

মামাবাবু বললেন, একটা উঁচু গাছের মাথায় চড়ে দেখ তো চারদিক।

আমি ছোটবেলায় গাছে চড়তে ওস্তাদ ছিলাম, কাজেই আমিই উঠলাম।

পরিষ্কার ঝকঝকে দিন। যেদিকে তাকাই চারপাশে চঞ্চল সমুদ্র। নীলচে-সবুজ ঢেউগুলি ফেনার মুকুট পরে নাচতে নাচতে ছুটে চলেছে। পশ্চিমদিকে দেখলাম বহু দূরে একটা

কালো রেখা। অস্পষ্ট। নিশ্চয় আফ্রিকা মহাদেশের পূর্ব উপকূল। কত দুর হবে? সাত-আট মাইল। যাক, খুব বেশি দূরে এসে পড়িনি। নেমে এসে রিপোর্ট করলাম।

আমাদের ডেরার কাছাকাছি আসতে দেখি তাঁবুর সামনে ভিড়। দ্বীপবাসীরা গোল হয়ে দাঁড়িয়ে। সর্দারও রয়েছে। মাঝখানে আমাদের নৌকোর দুজন মাঝি, যে দুজন দুর্ঘটনায় অক্ষত আছে। কী ব্যাপার? তাদের হাত পিছমোড়া করে বাঁধা। দ্বীপের লোকেরা উত্তেজিত স্বরে কথা বলছে। মনে হচ্ছে কোনো কারণে খুব চটেছে।

এর মধ্যে আবার কী ফ্যাসাদ বাধল রে বাবা।

মামাবাবু আমাদের অপেক্ষা করতে বলে ভিড়ের মাঝে ঢুকে গেলেন।

অনেকক্ষণ তিনি সর্দার ও অন্যান্যদের সঙ্গে কথা বললেন। মাঝিদের কী সব জিজ্ঞাসা করছেন দেখলাম। মনে হল ধমকাচ্ছেন। তারপর ভিড় ঠেলে বেরিয়ে এলেন। সঙ্গে সঙ্গে সর্দার ও তার লোকজনরা মাঝি দুটিকে নিয়ে গ্রামের দিকে রওনা দিল।

মামাবাবু বললেন, আর বল কেন, লোক দুটো এক নম্বর বুন্ধু। এক কাণ্ড বাধিয়েছে। ওদের বিশ্বাস হয়নি যে সত্যি এরা কদিন পরে আমাদের দেশে ফেরত পাঠাবে। তাই সকালবেলা নিজেরাই একটা নৌকো চুরি করে পালাবার তাল করছিল। কিন্তু তীর থেকে জলে নৌকো নামাবার আগেই দ্বীপের লোকেরা দেখে ফেলে। ব্যস, ছুটে গিয়ে ধরে-বেঁধে

আনে। আমাদের কাছে এসেছিল এই চক্রান্তে আমাদেরও কোনো হাত আছে কিনা জানতে। ওদের কাছে নৌকো অত্যন্ত মূল্যবান সম্পত্তি, তাই নৌকো চুরির চেষ্টা করায় দারুণ চটেছে। তারপর আবার মাঝিরা আরব। আরবদের এরা মোটেই সুনজরে দেখে না। উপজাতিদের ওপর তো কম অত্যাচার করেনি আরবরা! যাহোক, ভাগ্যিস ঠিক সময় এসে পড়েছি, নইলে একটা খুন-খারাপি হয়ে যেত। অনেক বলে-কয়ে ওদের শারীরিক অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচিয়েছি। কিন্তু ছাড়বে না, বন্দী করে রাখবে! বিশ্বাসভঙ্গ এদের কাছে মারাত্মক অপরাধ।

কিন্তু আমাদের সঙ্গে শেষে ফিরে যেতে দেবে তো? আমি জিজ্ঞেস করি।

দেবে। মানে যাতে দেয়, সে-চেষ্টা নিশ্চয় করতে হবে। রাগ কমুক। তারপর বুঝিয়ে শুনিয়ে রাজি করাব।

অন্য দুজন মাঝি কাণ্ড দেখে ভীষণ ঘাবড়েছিল। তারা আমাদের কিছুতেই ছাড়বে না। সঙ্গী দুজনের দুরভিসন্ধির কথা তারা বিন্দুবিসর্গ জানত না। অসহায় বন্ধুদের ফেলে কেটে পড়ছিল শুনে গালিগালাজ করে বেইমানদের চোদ্দপুরুষ উদ্ধার করতে লাগল।

আমরা অনেক বুঝিয়ে তাদের অভয় দিলাম। খবরদার! লুকিয়ে পালাবার চেষ্টা কোরো না। দেখলে তো কী সাংঘাতিক ফল হতে পারে! আমরা যদি ফিরি তোমাদের ফেলে রেখে যাব না।

যার কোমরে ব্যথা, সে-বেচারা হাঁটাচলা করতে পারে না। শুয়ে থাকে। অন্যজনের অবস্থা মোটামুটি ভালো। তার ব্যান্ডেজ বাঁধা ডান হাতটা গলায় দড়ি দিয়ে ঝোলানো। তার ওপরেই কোমর ভাঙা লোকটির দেখাশোনার ভার দিলাম।

মধ্যাহ্নভোজন সারলাম। মেনুটিনের মাংস ও নারকেল। খাওয়ার পর একটু বিশ্রাম নিয়ে মামাবাবু বুট, টুপি, চামড়ার জারকিন ইত্যাদি ধড়াচূড়া এঁটে ব্যাগে স্পেসিমেন সংগ্রহের নানারকম সরঞ্জাম নিয়ে জঙ্গল ছুঁড়তে বেরোলেন। আমি ও সুনন্দ গেলাম সমুদ্রতীরে মাছধরা দেখতে।

তিনটি ছোট ছোট ডিঙিনৌকো চেপে সাত-আটজন লোক সমুদ্রে মাছ ধরছিল। তাদের কারও হাতে ছোট দড়ির জাল, কারও হাতে বল্লম, মাছ ভাসলেই গেঁথে ফেলবে। বল্লমের পিছনে দড়ি বাঁধা। শিকারকে বিদ্ধ করবার পর টেনে আনা যাবে। অদ্ভুত ব্যালান্স এদের। সরু নৌকোর ওপর বসছে, দাঁড়াচ্ছে। ঢেউয়ের মাথায় টলমল নৌকোগুলো অপূর্ব দক্ষতায় চালনা করছে। জলের জায়গায় জায়গায় শিলাস্তূপ। নৌকো তাদের গায়ে ধাক্কা খেলে। চুরমার হয়ে যাবে। এরা অনায়াসে সেসব বাধা এড়িয়ে নৌকো নিয়ে ঘুরছিল।

সুনন্দের শখ হল নৌকো চাপবে। পারে কয়েকজন দাঁড়িয়েছিল, তাদের ভাঙা ভাঙা সোয়াহিলিতে অনুরোধ করল। কিন্তু তারা তৎক্ষণাৎ মাথা নেড়ে আপত্তি জানাল, আপানা অর্থাৎ না না।

আমি ক্ষেপালাম, যদি অতিথি দেবতা জলে ডুবে অক্কা পায়। গেরস্তের অকল্যাণ হবে। তাই রাজি হচ্ছে না।

সুনন্দ রেগে বলে, যা যাঃ। আমি পূর্ব বাংলার ছেলে। পদ্মায় অমন ঢের ঢের নৌকা বাইসি। জলে ডোবা অত সস্তা নয়।

কিন্তু এটা নদী নয়, সমুদ্দুর।

জানি। তবে পদ্মার ঢেউও খুব সোজা নয়। তাছাড়া আমি তো আর একা চাপতে চাইছি না। ওদের সঙ্গে থেকে একটু প্র্যাকটিস করতাম।

অজস্র ছোট-বড় নানা রঙের কাঁকড়া। বালির ভিতর গর্ত থেকে উঠে দৌড়াদৌড়ি বা পদচারণা করতে করতে আবার টুক করে গর্তে সেঁধুচ্ছিল। সুনন্দ বলল, আয়, ধরি।

প্রাণপণ চেষ্টায় গলদঘর্ম হয়ে আট-দশটা কাঁকড়া ধরলাম।

দ্বীপের লোকেরা আমাদের লক্ষ করছিল। একজন এগিয়ে এসে আমাদের একটা কাঁকড়া উপহার দিল।

প্রকাণ্ড সামুদ্রিক কাকড়া। খোলাটা যেন একখানা ছোট কড়াই। দাঁড়াগুলো তেমনি লম্বা ও মোটা, সাঁড়াশির মতো। নিশ্চয় শাঁসে ভরা।

সুনন্দ আহ্লাদে আটখানা হয়ে উপহারদাতাকে বারবার হ্যান্ডসেক করে পিঠ চাপড়ে ব্যতিব্যস্ত করে তুলল।

প্রতিদানে কী দেওয়া যায়?

সে পকেট হাতড়ে বের করল একটা রঙচড়ে রাংতা। চকোলেটের। দুঃখের বিষয় চকোলেটটি সে খেয়ে ফেলেছে। আর কিছু নেই। রাংতাই দেব? তাই সই।

লাইটারের ম্যাজিক দেখাবার পর থেকে এরা সুনন্দকে রীতিমতো সমীহ করে। তাই মাহিন্ডি জাদুকরের কাছে এমন খাতির পেয়ে এবং এমন চমৎকার চকচকে একখানা উপহার লাভ করে লোকটি তত বেজায় খুশি হয়ে গেল।

ফেরার সময় সুনন্দ বলল, ইস, কী যে আপশোস লাগছে! সঙ্গে মশলাপাতি নেই, এমন পেল্লাই কঁকড়াটা জুত করে রান্না করা যাবে না। চল সিদ্ধ করি, নুন-গোলমরিচ দিয়ে শাসটা খাই। নেহাৎ মন্দ লাগবে না।

.

০৬.

রাত্রে দ্বীপের নিয়মিত ক্যাম্প-ফায়ারে যোগ দিলাম।

আমাদের প্রথম দিনের আড়ষ্টতা কেটে গেছে। এখন অনেক সহজ।

দুদিন সান্ধ্য বৈঠকেই একটা বিচিত্র ব্যাপার আমাদের নজরে পড়েছিল।

প্রথম দিন তিনটি এবং দ্বিতীয় দিন একটি লোক আগুনের পাশে গুটিসুটি মেরে কুঁকড়ে বসে আছে। মাঝে মাঝে কেঁকাচ্ছে। প্রথমে ভেবেছিলাম পেটব্যথা। কিন্তু পরে তাদের গায়ে হাত দিয়ে দেখেছি গা খুব গরম। বেশ জ্বর।

অসুস্থ লোকগুলির চিকিৎসার ব্যবস্থাও দেখলাম।

মাহঙ্গা অর্থাৎ ওঝা কামাউ দ্বীপের বদ্যি। তার নির্দেশে অন্যরা লোকগুলিকে ধরে ধরে নিয়ে একটি ছোট কুটিরের মধ্যে ঢোকাল।

কৌতূহলী হলেও প্রথমে কী ডাক্তারি হচ্ছে দেখার সুযোগ পাইনি। দ্বিতীয় দিনে উঁকি মেরে লক্ষ করলাম।

দেখি কুটিরের মধ্যে এক চুলি জ্বলছে! রুগীরা আগুনের পাশে শুয়ে পড়ল। তাদের গায়ের ওপর কয়েকটা জানোয়ারের ছাল চাপিয়ে দেওয়া হল। তারপর কামাউ এসে দু-চারটে মন্ত্র আউড়ে খানিকটা তরল পদার্থ প্রত্যেক রুগীকে খাইয়ে দিল। অতঃপর তাদের সেখানে রেখে অন্যরা ফিরে এল।

এই দেশি টোটকায় খুব উপকার হয় বলে বিশ্বাস হয়নি। কারণ, দেখছি লোকগুলি সে-রাতে আর উঠতে-বসতে পারেনি। জ্বরে অচেতন হয়ে রয়েছে।

তবে রোগ মারাত্মক নয়। কারণ পরে দেখেছি তাদের, আবার চলে-ফিরে বেড়াচ্ছে। দুর্বল দেহ, চোখে-মুখে শ্রান্ত অবসন্ন ভাব। বোধহয় জ্বর নেই বা কমে গেছে। কে জানে কী ব্যারাম!

আগেই বলেছি এখানে আমাদের কিছু অনুরাগী জুটেছিল। একদল বালক-বালিকা। তারা সর্বত্র ছায়ার মতো আমাদের অনুসরণ করেছে। লক্ষ্য করেছে আমাদের হাবভাব। পুরো দেড়দিন আমাদের সঙ্গ ছাড়েনি।

ক্রমে তাদের বিদেশিদের প্রতি উৎসাহ কমে গেল–শুধু একজন ছাড়া।

ছেলেটিকে আমরাও নজর করেছিলাম, বয়স সতেরো-আঠারো। যেন কষ্টিপাথরে কোঁদা শরীর। চোখাচোখি হলেই দু সারি মুক্তোর মতো দাঁত বের করে হাসত। আমাদের সম্বন্ধে তার কৌতূহল অদম্য।

তৃতীয় দিন ভোরে দেখি–ইতিমধ্যে ছেলেটি এসে তাঁবুর সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

সুনন্দ বলল, ছোঁড়া পেটুক। দেখেছিস যখনই আমরা খেতে বসি, এসে আমাদের খাওয়া দেখে। জিভ চাটে।

দুগ্ধহীন কফি ও বিস্কুট সহযোগে প্রাতরাশ সারছি, ছেলেটি যথারীতি কাছে এগিয়ে এল।

সুনন্দ একটা বিস্কুট বাড়িয়ে সোয়াহিলিতে ডাকল, ভিতরে এস, ভয় নেই। খাবে?–টাকা কুলা?

সে তৎক্ষণাৎ খানিক দূরে সরে গিয়ে মাথা নাড়াতে লাগল। জাদুমন্তর জানা বিদেশিদের বড় ভয়।

আমি ও সুনন্দ খুব ডাকাডাকি করতে থাকি, অভয় দিই। বারবার দেখিয়ে দেখিয়ে বিস্কট খাই এবং হাত বাড়িয়ে অফার করি, খাও খাও, লজ্জা কী?

এই টোপেই কাজ হল। গুটিশুটি এগিয়ে এসে ছেলেটা টপ করে সুন্দর হাত থেকে বিস্কুট নিয়ে ফের দূরে সরে গেল।

ঘুরিয়ে ফিরিয়ে জিনিসটা পরীক্ষা করল। শুকল। তারপর ভয়ে ভয়ে এক টুকরো কামড়াল।

খানিকক্ষণ সে চোখ বন্ধ করে মুখ কুঁচকে বস্তুটির আস্বাদ নিল। তারপরই ফিক করে হাসি! বাঃ, খানা, গ্র্যান্ড! মুজুরি সানা।

সঙ্গে সঙ্গে বাকিটুকু মুখে পুরে কামড়িয়ে চিবিয়ে আবার হাত পাতল, ইঙ্গিনে মোজা। অর্থাৎ আর একটা।

তার নামটি জেনে নিই। বলল, জেনা ইয়াঙ্গু টোটো। অর্থাৎ আমার নাম টোটো।

টোটো ফের হাজির। ঘড়ি ধরে ঠিক বারোটায় বোধহয় সারা সকালটা সে তার ছায়ার ওপর দৃষ্টি রেখে এই মাহেন্দ্রক্ষণটির প্রতীক্ষা করছিল। এখন তার লজ্জা-ভয় কমে গেছে। একবার ডাকতেই তাঁবুর মধ্যে ঢুকে এককোণে উবু হয়ে বসল।

আমাদের সঙ্গে চাল ছিল। ফেন-ভাত বেঁধেছিলাম, সঙ্গে মাখন ও টিনের মাংস।

প্লেটে অল্প মাংস দিয়ে টোটোর সামনে রাখলাম। কচ্ছপের মাংস, সামান্য মশলা দেওয়া। একবার গরম করে নিলেই খাসা খেতে। সুনন্দ বলল, দেখ হে টেস্ট করে। তোমাদের তো যত ঝলসানো আর আধপোড়ার কারবার, এ-বস্তুর মর্ম বুঝলে হয়!

টোটো দেখল, শুকল, চাটল, তারপর সন্তর্পণে একটু মুখে পুরল। আধ মিনিট তার চক্ষুমোদা, সমস্ত ইন্দ্রিয় স্বাদগ্রহণে তন্ময়। চোয়াল অল্প অল্প নড়ছে। হঠাৎ চোখ খুলল! মুহূর্তে বাকি মাংস নিঃশেষ এবং প্লেটসহ হস্ত প্রসারিত, মুফা–আরও দাও।

আধ টিন মাংস শেষ করার পর আমরা বাধ্য হয়ে তাকে আর পরিবেশন করতে নারাজ হলাম।

ব্যস, এরপর থেকে সে আমাদের নিয়মিত অতিথি বনে গেল। যেখানেই থাকুক খাবার সময় তার হাসিমুখটি ঠিক তাঁবুর দরজায় উঁকি মারবে।

টোটোর সঙ্গে আমাদের খুব ভাব হয়ে গেল। দ্বীপের সোয়াহিলি বুঝতে আর এখন আমাদের তেমন কষ্ট হয় না। মামাবাবু একদিন ঠাট্টা করে বললেন, কেন মাথা খাচ্ছ। ছেলেটার? তোমরা তো দুদিন পরে চলে যাবে, তখন? দেশি রান্না কি আর ওর মুখে রুচবে?

সুনন্দ বলল, সে আমি ভেবে রেখেছি। অনেকগুলো মাছ-মাংসের সোজা সোজা রান্না আমি টোটোকে শিখিয়ে দেব। তারপর যেদিন উপকূলে ফিরব, ওকে সঙ্গে নেব। ওখান থেকে প্রচুর টিনফুড আর দরকারি মশলাপাতি কিনে দেব। মাটির হাঁড়ি-কুড়ি ওরা বানাতে পারে! মাছ-মাংসের অভাব নেই। যখন ইচ্ছে খুশিমতো মুখ বদলাবে।

টোটোকে আমি জিজ্ঞেস করেছি, এ-দ্বীপে তোমরা কতদিন এসেছ?

অ-নে-ক-দিন। আমার জন্ম তো এখানে।

আগে কোথায় থাকতে?

আগে ছিলাম এ-মহাসাগর, বাহারিকু, এই সমুদ্র পেরিয়ে ওপারের দেশে। বালিসানা–অনেকদূরে-পাহাড়-জঙ্গলের রাজ্যে।

সুনন্দ বলল, আচ্ছা এখন সবার সঙ্গেই আমাদের বেশ ভাব-সাব হয়েছে, কিন্তু কামাউ-এর ব্যাপারটা কী? আমাদের সঙ্গে কথা বলে না, কাছে আসে না, কেন?

কামাউ কোনো বিদেশিকেই পছন্দ করে না। আর সাদা মানুষদের ওপর তো ভীষণ চটা।

কেন?

শুনেছি, কামাউ যখন ছোট ছিল, একদল শয়তান সাদামানুষ তাকে দূর দেশে ধরে নিয়ে যায়। খুব অত্যাচার করে। অনেক কষ্টে কামাউ পালায়। সেই থেকে তার রাগ। মাহিন্ডি বলে বেঁচে গেছ, সাদাদের বাগে পেলে ও খুন করতে পারে।

টোটো একদিন সকালে এল না, দুপুরেও এল না, এল রাত্রে। তাঁবুর কাছে গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে সতর্কভাবে দেখল, তারপর গুটিগুটি তাঁবুর গা ঘেঁষে ছায়ায় বসল। কী ব্যাপার?

শুনলাম, কামাউ তাকে ধমকেছে, এই ছোঁড়া, মাহিভিগুলোর কাছে অত ঘুরঘুর কীসের? শুনছি ওখানে অখাদ্য-কুখাদ্য গিলিস। খবরদার ভালো হবে না বলে দিচ্ছি। বিদেশিদের সঙ্গে অত ভাব চলবে না।

কী হিংসুটে লোক! কিন্তু পেটুক টোটোকে ভয় দেখিয়ে আটকানো যায়নি। তবে বলে গেল দিনের বেলায় আর আসবে না। রাত্তিরে আসবে। সবাই যখন নাচ-গানের জন্য তৈরি হচ্ছে, তখন লুকিয়ে।

এই দ্বীপের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে আমরা কিছু কিছু জেনেছি।

দ্বীপের জনসংখ্যা একশোর বেশি নয়। এরা চাষবাস ভালোবাসে না। সামান্য ভুট্টা, রাঙাআলু ও দু-এক রকম শস্য ফলায়। জীবনধারণের প্রধান উপায় শিকার ও মাছধরা। গরু ও ছাগল পোষে। মাংসের অভাব মেটে। আধুনিক জগতের সঙ্গে যোগাযোগ তাদের খুবই কম। পারতপক্ষে মহাদেশের মাটিতে পা দেয় না। নৌকো এদের মহামূল্যবান সম্পদ। নৌকো চুরি করতে গিয়ে আমাদের মাঝিদের কী হাল হয়েছিল তা তো আগেই বলেছি। সামান্য কয়েকটি লোহার হাতিয়ার সম্বল করে অনেক কষ্টে গাছের গুঁড়ি কেটে নৌকো বানায়।

ছোট আর মাঝারি ডিঙিগুলো কাছাকাছি মাছ ধরার জন্য। কয়েকটা বড় ছিপ নৌকো আছে দূরে পাড়ি দেবার উদ্দেশ্যে।

মামাবাবু প্রত্যহ দ্বীপের সান্ধ্য আসরে যোগদান করে এদের আচার-ব্যবহারের খুঁটিনাটি লক্ষ করতেন। নোট করে রাখতেন। এমন চমৎকার গবেষণার ক্ষেত্র পেয়ে মাফিয়া না, যেতে পারার শোক তিনি বেমালুম ভুলে গেছেন।

.

০৭.

দ্বীপবাসের পঞ্চম দিন। সন্ধেবেলা। আমি ও সুনন্দ তাঁবুর ভিতর বসে রাতের খাবারের আয়োজন করছি। মামাবাবু তার নিজের কামরায়। সারাদিনের সংগ্রহ নমুনাগুলি সাজিয়ে। গুছিয়ে রাখতে ব্যস্ত। টোটো যথারীতি হাজির। তাঁবুর পাশটিতে উবু হয়ে বসে। কেমন, চুপচাপ। কথাবার্তা বলছে না। হঠাৎ সে সটান মাটিতে শুয়ে পড়ল।

কী হল, কী হল?

তাড়াতাড়ি কাছে গিয়ে গায়ে হাত দিয়ে দেখি খুব জ্বর। গা পুড়ে যাচ্ছে।

আমাদের ডাক শুনে মামাবাবু বেরিয়ে এলেন। টোটোর জিভ, চোখ ইত্যাদি পরীক্ষা করে বললেন, , যা ভেবেছি, ম্যালেরিয়া। আগুনের ধারে অসুস্থ লোকগুলোকে দেখেও আমার এই সন্দেহ হয়েছিল।

এ্যাঁ, এখানে ম্যালেরিয়া? আমরা দুজন অবাক। এটা তো জানতাম আমাদের দে পেটেন্ট অসুখ। অন্য দেশেও ম্যালেরিয়া আছে?

নিশ্চয়। মামাবাবু বললেন, আফ্রিকা হচ্ছে ম্যালেরিয়ার ডিপো। এখান থেকে পথিনী বহু জায়গায় ম্যালেরিয়া ছড়িয়েছে। ম্যালেরিয়ার কবলে পড়ে এই মহাদেশে বহু উপজাতি ধ্বংস হয়ে গেছে। মাফিয়ায় যেখানে যাচ্ছিলাম, সেখানেও খুব ম্যালেরিয়া হচ্ছিল। হাইন তাই আমাকে বেশ কিছু ম্যালেরিয়া-প্রতিরোধক ট্যাবলেট নিয়ে যেতে লিখেছিলেন। যাক

ওষুধগুলো কাজে লেগে যাবে। সুনন্দ আমাদের বড় প্যাকিং-বাক্সটার মধ্যে দেখবে একটা হলুদ রঙের প্যাকেট রয়েছে। নিয়ে এসো তো!

ওষুধ মুখে নিয়ে টোটো থু থু করে ফেলে দিল। আমরা বোঝাই, খেয়ে নাও ভাই, দেখবে অসুখ সেরে যাবে। লক্ষী ছেলের মতো খেলে তবে অনেকগুলো বিস্কুট পাবে। বিস্কুটের লোভেই বোধহয় সে মুখ বিকৃত করে, বড়ি কটা গিলে ফেলল। তাকে তাবর। মধ্যে শুইয়ে দিয়ে দুটো কম্বল ঢাকা দিয়ে দিলাম।

কিছুক্ষণ পর গায়ে হাত দিয়ে দেখলাম জ্বর কমেছে।

ঘণ্টাতিনেক পর টোটো উঠে বসল। গরম চা-বিস্কুট খেল। সে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল। সত্যি মাহিন্ডিদের ওষুধের আশ্চর্য গুণ। এই হোমা অর্থাৎ কাঁপুনি-জ্বর তার আগেও হয়েছে, কিন্তু এত তাড়াতাড়ি কখনো ভালো হয়নি। আর জ্বরের পর এত চাঙ্গা কখনো বোধ করেনি। প্রতিবারই ভীষণ দুর্বল হয়ে গেছে।

বারবার ধন্যবাদ জানিয়ে সে বিদায় নিল।

অনেক রাত হয়ে গিয়েছিল। সেদিন আর দ্বীপের সান্ধ্য আসরে গেলাম না! মামাবাবু বললেন, সঙ্গে তো মশারি আছে, এবার বের করো। জেনেশুনে ম্যালেরিয়া বাধিয়ে কাজ নেই।

পরদিন ভোরবেলা। সবে ঘুম ভেঙেছে। একজন লোক এসে তাঁবুর সামনে বেজায় হাঁকাহাঁকি শুরু করে দিল।

সর্দার ডাকছে, জলদি।

হঠাৎ সর্দারের তলব কেন?

তা জানি না। বলে দিয়েছে সেই দাওয়াই নেবে।

দাওয়াই? ওষুধ? কীসের? ঐ যে টোটোকে খাইয়েছিলে। সেই ওষুধ।

ব্যাপারটা কিঞ্চিৎ আঁচ করি। সর্দার কি চটেছে? তার অগোচরে বিদেশি ওষুধ খাওয়ানো কি অপরাধ হয়ে গেল? পরোপকার করতে গিয়ে নতুন ফ্যাসাদ বাধালাম না তো? টোটোও আচ্ছা পেট আলগা, কী দরকার ছিল জানানোর? অবশ্য আমরাও তাকে বারণ করিনি বলতে।

অগত্যা তিনজনে দূতের সঙ্গে চললাম। দুরু দুরু বক্ষে সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে যাই। হুকুম মাফিক কিছু ম্যালেরিয়ার ট্যাবলেটও নিলাম।

গ্রামের ডাক্তারখানা। সেই ছোট্ট কুটির।

সর্দার তার দলবল নিয়ে অপেক্ষা করছিল। যেতেই কুটিরের ভিতরে আঙুল দেখিয়ে বলল, এদের ওষুধ দাও, জ্বর হয়েছে। কাল যেমন টোটোকে দিয়েছ, তেমনি–

টোটো সামনে ছিল। দাঁত বের করে হাসল। বিরক্ত হয়ে মুখ ঘুরিয়ে নিলাম। যত নষ্টের মূল।

কুটিরের ভিতর দুজন লোক শুয়ে জ্বরে কাঁপছিল। মামাবাবু ভিতরে ঢুকলেন। পরীক্ষা। করে বললেন, হুঁ-ম্যালেরিয়া। ট্যাবলেট দিলেন। সর্দারকে বললেন, পরে আমায় খবর দিও গা গরম কমেছে কী না।

সর্দার বলল, এ-অভিশাপ দ্বীপে আগে ছিল না। মাত্র বছরখানেকের আমদানি। কয়েকজন উপকূল থেকে ঘুরে এসে এই হোমা অর্থাৎ কাঁপুনি-জ্বরে পড়ে। ক্রমে আজ দ্বীপের অধিকাংশ লোককে এই রোগ ধরেছে। সহজে মরে না কেউ, কিন্তু দিন দিন দুর্বল করে দিচ্ছে আমাদের। আমার নিজেরও একবার জ্বর হয়েছিল। জ্বর ছেড়ে গেল দুদিনে। কিন্তু ওঃ, পরে সাত দিন ধরে পা টলত, মাথা ভনভন করত। টোটো বলছে, তোমাদের ওষুধ খেয়ে নাকি অল্পক্ষণেই জ্বর সেরে গেছে, আর এক রাতেই তাজা হয়ে উঠেছে। তাই তো ডাকলাম। কী যে করি এই নিয়ে! কামাউ বলে, দুষ্ট্র অপদেবতা ভর করেছে। অনেক পুজো-টুজো তো দিচ্ছি, কিন্তু তাড়াতে পারছি না।

প্রায় দুঘণ্টা পর।

দেখি একটা বড় দল ক্যাম্পের দিকে এগিয়ে আসছে। সর্দার সামনে। সেই রুগী দুজনও রয়েছে। হেঁটে আসতে পারছে, অর্থাৎ জ্বর কমেছে। আমরা গম্ভীর মুখে অপেক্ষা করি।

রুগী দুজন সামনে এসেই সটান শুয়ে পড়ল, জয় বাবা মাহিন্ডি! কী দাওয়াই দিয়েছ। জাদু!

সর্দার বলল, আশ্চর্য ওষুধ তোমাদের। এতদিন কামাউ-এর ওষুধ খেয়েছি। কিন্তু এ অদ্ভুত ব্যাপার কোথায় শিখলে?

সুনন্দ চাল মেরে বলে, হুঁ হুঁ বাবা, এ কি যে-সে জিনিস! মন্ত্রপূত করা। কামাউ এ-বস্তু পাবে কোথা? গুরুর কাছে শিখতে হয়।

মাহিন্ডিদের অসামান্য শক্তি দেখে সবাই ভক্তিতে গদগদ।

মামাবাবু বললেন, আবার কারো জ্বর হলে খবর দিও, বা এখানে পাঠিও। না-না, পাঠানোর দরকার নেই, আমরাই যাব। প্রত্যেকদিন সকালে ঐ কুটিরে।

রুগীরা দুটো বড় বড় ডাব নিয়ে এল। ডাক্তারের ফি!

সবাই খুশি, শুধু একজন ছাড়া। দূরে দাঁড়িয়ে দেখছে, কপালে ভ্রুকুটি, হিংস্র চাউনি। সে কামাউ।

.

০৮.

ঘটনাটায় আমাদের দ্বীপের জীবনযাত্রা এক নতুন পথে মোড় নিল।

প্রত্যেকদিন সকালে একবার গ্রামের হাসপাতালে হাজির হই, দু-একটি রুগী মজত থাকে প্রত্যেকদিন।

দ্বীপের প্রত্যেকটি লোকের মধ্যেই বোধহয় ম্যালেরিয়ার জীবাণু সংক্রামিত হয়েছে। শিশু ও বালক-বালিকারাই ভোগে বেশি। এদের জীবনীশক্তি খুব জোরালো। তাই দু-এক ডোজ ওষধ খেয়েই গা-ঝাড়া দিয়ে ওঠে। কিন্তু এভাবে কতদিন যাবে? সাময়িকভাবে প্রতিরোধ করে কী লাভ! বারবার জ্বর হয়ে প্রাণশক্তি যে ক্ষয় হয়ে যাবে। মামাবাবু বললেন, ফিরে গিয়ে স্বাস্থ্যদপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। ওষুধপত্র নিয়ে দল পাঠাতে হবে। ডিডিটি ছড়িয়ে ম্যালেরিয়ার বিষবাহী মশা ধবংস করতে হবে, নইলে এরা মরবে।

আমাদের খাতির এখন দেখে কে?

নাচ-গানের আসরে সর্দারের পাশেই আমাদের আসন নির্দিষ্ট হয়েছে। তাদের সঙ্গে নাচে যোগ দিতে আমাদের সাধাসাধি করে। তাল বুঝে সুনন্দ একদিন লাফিয়ে উঠে নাচ শুরু করে দিল। আধঘণ্টা নেচে-কুঁদে বেদম হয়ে সে বসে পড়ে। সকলে খুব তারিফ কল, তোমার হবে। কদিন অভ্যেস করলেই হবে। ফার্স্ট ক্লাস নাচিয়ে হয়ে যাবে। শুনে সুনন্দের কী গর্ব!

আমার বাবা নাচার শখ নেই! তবে ওদের নাচের তালে পা আপনি নেচে ওঠে। তখন চুপ করে বসে থাকা যায় না। আমি তাল ঠুকি। টিনের কৌটো বাজাই। মামাবাবুকেও দেখেছি ঘাড় নেড়ে তাল দিচ্ছেন।

নাচ এদের রক্তে। ছেলে-বুড়ো মা-মেয়ে সবাই নাচের নামে পাগল। থুথুরে বুড়ো, বয়সের ভারে বেঁকে গেছে, সেও পা ঠোকে। হাততালি দেয় নাচের সাথে। এদের সমস্ত সুখ-দুঃখের প্রকাশ নাচের মাধ্যমে।

সমুদ্রে একটা বড় মাছ উঠল। অমনি তীরে যারা ছিল একপাক নেচে নিল। শুয়োর মারা হয়েছে, ভালো খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা আজ, ব্যস, নাচ চলবে দু-গুণ। আবার একজন বুড়ো মরল, তার শ্রাদ্ধেও দেখি সবাই নেচে নেচে শোক প্রকাশ করছে।

সর্দার নাচে। কামাউও নাচে। চত্বরের একটু বাইরে এদের এক মন্দির আছে। উঁচু টিলার ওপর ছোট্ট ঘর। দেয়াল ও মাথার ছাউনি অন্য ঘরের মতো। কোমর সমান উঁচু এক প্রবেশপথ। তার ওপর তক্তা দিয়ে বন্ধ থাকে। কামাউ প্রত্যেক দিন সন্ধেবেলা সেই দরজা খুলে ভিতরে দেবতার উদ্দেশে মন্ত্র-টন্ত্র পড়ে। সেই দেবতার চেহারা আমরা দেখিনি। কামাউ একা যায়, অন্য কেউ যায় না। বিশেষ উৎসবে নাকি দেবতাকে বের করা হয়। আমাদের দেবভক্তি তেমন প্রবল না হওয়ায় ও-বিষয়ে মাথা ঘামাইনি।

তবে যে-কথাটা বলতে যাচ্ছিলাম তা হল, কামাউয়ের পুজোর পদ্ধতি।

দু-চার লাইন মন্ত্রপাঠ। তারপর সে মন্দিরের চারপাশে বারকয়েক নেচে নেচে ঘুরবে। পুজো শেষ। এইবার সে আসবে চত্বরে। মজলিসে যোগ দেবে। সেখানেও সে নাচে। তবে রোজ নয়, বিশেষ উপলক্ষে। তার নাচের বিশেষত্ব আছে।

সে নাচবে একা। অন্যরা তখন ওঠে না। ঢাক আর ডামের আওয়াজ চতুর্গুণ হয়ে ওঠে। কী সমস্ত সাংঘাতিক অঙ্গভঙ্গি ও মুদ্রা, তেমনি বিকট মেকআপ! মুখে বুকে হাতে পায়ে লাল কালো সাদা হলদে রঙের ছড়াছড়ি। হঠাৎ দেখলে বুক ধড়াস করে ওঠে। কী বাবা ওটা? মানুষ না রাক্ষস?

ভাঁটার মতো চক্ষুতারকা ঘুরছে। গায়ে হাড়ের গয়নায় খটাখট আওয়াজ। মাথায় লম্বা লম্বা পালকের মুকুটে ঝোড়ো কাপন। থেকে থেকে হুহুঙ্কার।

ভূতপ্রেত অপদেবতা বশ করা হচ্ছে কিনা, তাই এইসব ভয়ঙ্কর কলাকৌশল।

সুনন্দ আপসোস করে, ইস একটা মুভি ক্যামেরা থাকলে যা হত! কোথায় লাগত হলিউডের ছবি!

আমাদের তাঁবু উপহারে ভরে যেতে লাগল। আমরা সর্দারের প্রিয়পাত্র, তাদের মহা উপকারী বন্ধু, সবাই চায় আমাদের সন্তুষ্ট করতে। উপহার যা আসে বেশির ভাগই খাদ্যবস্তু। মাছ, মাংস, পাখি, কচ্ছপের ডিম, কাঁকড়া। ফলটলও আসে। একরকম শিম আসত, দেশি শিমের মতো স্বাদ। আর আসত কাড়িকাড়ি নারকেল ও জল-ভরা কচি মিষ্টি ডাব।

একটা চিংড়িমাছ দিয়েছিল, খোলাটা বাঁশের মতো মোটা। দুহাত লম্বা। একটির কালিয়াতে বাড়িসুদ্ধুর পেট ভরে যাবে। সুন্দর তো চোখে জল আসার উপক্রম। আহা। এমন জিনিসটি যদি-মাসিমার (আমার মার) হাতে পড়ত! যাহোক নারকেল দিয়ে চিংড়িমাছের মালাইকারি গোছের কী একটা যে বানাল!

খেতে খেতে মামাবাবু বললেন, বাঃ, চমৎকার হয়েছে মাছটা!

সত্যি সুনন্দর কৃতিত্ব আছে। আমাদের সঙ্গে আনা যৎসামান্য মশলা দিয়ে কত কত কী নতুন রান্না খাইয়ে মুখের একঘেয়েমি কাটিয়ে দেয়।

টোটো এখন বুক ফুলিয়ে আসে। কামাউকে ঘোড়াই কেয়ার করে। বরং আমাদের সঙ্গে

দোস্তি আছে বলে বন্ধুমহলে তার খাতির বেড়েছে।

আমাদের দিন কাটছে প্রায় একই ধাঁচে। মামাবাবু সকালে বেরিয়ে ফেরেন দুপুরে। পোকা-মাকড়, ফল-ফুল-পাতা কত কী যে জোগাড় করে আনেন! দুপুরে একটু বিশ্রাম নিয়েই বসেন স্পেসিমেনগুলির পরিচয় উদ্ধার করতে। বই ঘাঁটেন, নোট করেন। যত্ন করে স্পেসিমেন বাক্সবন্দী করেন।

একদিন ফিরলেন, হাতে কয়েকটা ধুঁধুল।

এখানে ধুঁধুল পেলেন কোত্থেকে?

বনের মধ্যে লতা আছে।

কিন্তু এখানে ধুঁধুল এল কী করে? আমি আশ্চর্য হয়ে বলি।

বাঃ, বঁধুল তো এখানকারই ফল! এখান থেকে ভারতে গিয়েছে। শুধু ধুঁধুল কেন, আরও অনেক ফল-ফুল বাইরে থেকে ভারতবর্ষে গিয়েছে। আজ আমরা তাদের ভাবি খাঁটি দেশি।

গেল কী করে?

বণিকরা এনেছে। পর্যটকরা এনেছে। অবশ্য ভারত থেকেও অনেক ফল-ফুল বিদেশে। গেছে।

ধুঁধুল ভাজা (তেল নয়, মাখন দিয়ে) খেয়ে একটু চেনা খাবারের স্বাদ পেলাম। বাড়ির কথা, মার হাতের রান্নার কথা মনে পড়ছিল। আহা কতদিন খাইনি!

সুনন্দের বেশ সুবিধে হয়েছে। সমুদ্রে নৌকো চালানোর শখ এতদিনে মিটেছে। এখন তাকে সাধাসাধি করতে হয় না, বরং কার নৌকোয় সে উঠবে সেই নিয়ে টানাটানি।

সুনন্দ আগে নদীতে ডিঙিনৌকো চালিয়েছে, কাজেই সমুদ্রে ডিঙি বাওয়া রপ্ত করতে তার সময় লাগল না। আমিও চাপি। তবে ওর মতো দাঁড়িয়ে বল্লম দিয়ে মাছ শিকারে সাহস হয় না। পারতপক্ষে আমি সুনন্দর সঙ্গে এক নৌকোয় উঠি না। যা দাপাদাপি করে।

প্রায়ই তার জন্যে নৌকো উল্টোয়। সাঁতরাতে সাঁতরাতে নৌকো সোজা করতে হয়। জলে হাঙর আছে, কোনোদিন ঘ্যাঁক করে ঠ্যাংখানা কেটে নিলে বুঝবে ঠ্যালা।

সুনন্দ একজনের কাছে বেজায় জব্দ। লুম্বাকে দেখলেই তার মুখ শুকিয়ে যায়। আমাকে বলেনি ব্যাপারটা, কিন্তু একদিন ঘটনাচক্রে জেনে ফেললাম।

বনপথে আসছি দুজনে। সারা সকাল ধরে মাছ ধরেছি। সাঁতার কেটেছি। পেটে চনচনে ক্ষিদে। হঠাৎ সুনন্দ বলল, এই খেয়েছে! বলেই সে চট করে একটা গাছের পাশে লুকোয়। তুই এগিয়ে যা, আমার দিকে তাকাসনি।

বেশ। আমি এগোলাম। সামনে দেখি একটি যুবক। ওকে চিনি, লুম্বা।

লুম্বাকে দেখেই লুকোল নাকি?

লুম্বাও আমাদের দেখেছে। দুজনকেই। কারণ সে আমার দিকে একবার তাকিয়েই সোজা সুনন্দকে লক্ষ্য করে দৌড়ল।

আমি হাঁ করে দেখছি ব্যাপারখানা।

লুম্বা ছুটে গিয়ে খ করে সুনন্দর হাত চেপে ধরল। এ্যা। মারবে-টারবে না কি?আমি বাধা দিতে এগোই।

আরে দূর দূর! এই জন্যে এত কাণ্ড! আমি হেসে ফেলি।

লুম্বা সুনন্দের ঘড়িসুদ্ধ কব্জিটা টেনে নিয়ে ঘড়িটা তার ডান কানের ওপর চেপে ধরেছে। তার চোখ বোজা, নাক-মুখ কুঁচকে প্রাণ ঢেলে শুনছে–

সুনন্দ অসহায়ভাবে বলে, দেখছিস, এই এক যন্ত্রণা! যখনই দেখবে টিক্ টিক্ শোনা চাই।

কিন্তু রহস্যটি টের পেল কী করে! তুই শুনিয়েছিলি বুঝি?

হুঁ। সুনন্দ বিরসবদনে বলে। একদিন মজা দেখতে ওর কানে ঘড়ি চেপে ধরেছিলাম। ব্যাটা তো আঁতকে উঠে মারল ডিগবাজি। তারপর বুঝিয়ে শুনিয়ে ভয় ভাঙিয়ে টিক্ টিক্ শোনালাম। ব্যস, সেদিন থেকে আরম্ভ হয়েছে এই গেরো।

এই ছাড় ছাড়! হাত ব্যথা হয়ে গেল যে।–আর একটু, আর একটু। লুম্বা এবার বাঁ কানের ওপর ঘড়ি চেপে ধরে।

সুনন্দ রেগেমেগে ঘড়ি খুলে দেয়! নাও শোনো।

পনেরো মিনিট পর অনেক ঝুলোকুলি করে তবে ঘড়ি ফেরত পাওয়া যায়। সবাই খুশি, শুধু কামাউ আর তার গুটিকয়েক ভক্তের মুখ দিন দিন থমথমে হচ্ছে। কামাউয়ের কয়েকজন ভক্ত ছিল। সর্বদা তার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরত। তাদের মধ্যে দুটিকে আমরা খুব চিনেছি। দুটি যেন মানিকজোড়। সর্বদা একসঙ্গে থাকবে। তাদের নাম দিয়েছিলাম ত্যাড়া-বাকা। আসলে বলা উচিত ছিল ট্যারা-বাকা। কারণ একজনের চোখ কিঞ্চিৎ ট্যারা এবং অন্যটির পা দুটো ধনুকের মতো বাঁকা।

লোক দুটো বেজায় লোভী এবং ধড়িবাজ। আমাদের কাছে প্রায়ই এটা-সেটা চাইত। আবার কখনো চাইত কামাউয়ের নাম করে। পরে খবর পেয়েছি সেসব উপহার বেশির ভাগ সময় কামাউয়ের হাতে পৌঁছয়নি। দুই শিষ্যই গাপ মেরে দিয়েছে।

যেদিন আমাদের চিকিৎসাপাট আরম্ভ হয়, তার দুদিন পরে। বিকেলে ক্যাম্পের বাইরে বসে আছি, হঠাৎ দেখি একজন আসছে এদিকে। ভূত দেখার মতো চমকে উঠলাম– কামাউ। কামাউয়ের হাঁটা ভুল হবার নয়। ব্যাপার কী?

কামাউয়ের দীর্ঘ শরীর সামনের দিকে নোয়ানো। যখন চলে দেহ সামনে আরও ঝুঁকে পড়ে ধনুকের মতো বেঁকে যায়। লম্বা লম্বা পা ছুঁড়ে ছুঁড়ে এগোয় যেন রণ-পা চড়ে হাঁটছে। আর হাত দুটো তার পেণ্ডুলামের মতো ক্রমাগত সামনে পিছনে দোল খায়।

জাম্বো, বানা অর্থাৎ নমস্কার।

কামাউ হাসি হাসি মুখে সম্ভাষণ জানায়। কিছু একটা মতলব আছে নিশ্চয়। মনের ভাব চেপে রেখে বলি, কুজা কুজা, অর্থাৎ আসুন আসুন। কী সৌভাগ্য! খেতি হিকো (এখানে বসুন)।–একটা প্যাকিং বাক্স এগিয়ে দিই।

কামাউ বসল না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বলে, বিদেশি মাহিন্ডি তোমরা দেখছি অনেক দৈবশক্তি-টক্তি রাখো। ওষুধ-টষুধ জানেনা। তা আমাকে ঐ হোমার দাওয়াই তৈরি শিখিয়ে দাও। তোমরা চলে গেলে আমাকেই তো চিকিৎসা করতে হবে।

ওঃ, এই মতলব!

সুনন্দ বাংলায় মামাবাবুকে বলে, দেখছেন কী ধড়িবাজ! এসে পর্যন্ত পিছনে লাগবার চেষ্টায় আছে, ভদ্রভাবে দুটো কথা অবধি বলেনি, এখন ওষুধ শিখে নাম কেনার ধান্দা। কী মিষ্টি মিষ্টি কথা বলা হচ্ছে!

মামাবাবুকে কিছু বলতে না দিয়ে সুনন্দ মেজাজের মাথায় বলল, ওষুধ তৈরি কী করে শেখাব? সেসব অনেক জিনিসপত্র লাগে। এখানে পাব কোথায়?

তাই বুঝি? কামাউ একটু দমে যায়। সেসব এখানে পাওয়া যাবে না?

না।

কামাউ খানিক ভাবে। তারপর বলে, বেশ তোমাদের কাছে কত ওষুধ আছে? কতদিন চলবে?

খুব বেশি দিন নয়। আমরা ডাক্তারি করতে হবে জেনে আসিনি। এই ধরো আর এক চাঁদ (অর্থাৎ একমাস)।

সুনন্দ বাড়িয়ে চলল। এই রেটে খরচ হলে ট্যাবলেট আর পনেরো দিন চলবে বড়জোর।

বেশ, যা ওষুধ আছে আমায় দিয়ে দাও। এবার থেকে আমিই চিকিৎসা করব। কামাউ বলে।

বটে, আবদার তো মন্দ নয়! কেন টোটোকে এখানে আসতে, আমাদের সঙ্গে মিশতে বারণ করার সময় মনে ছিল না? সুনন্দ বাংলায় জানায়।

তারপর কামাউকে বলে, তা তো সম্ভব নয়।

কেন? কামাউয়ের মুখ গম্ভীর।

ওষুধের গুণ নষ্ট হয়ে যাবে। গুরুর কাছে অনেক দিনের চেষ্টায় ওষুধ তৈরি শিখেছি। গুরু বলেছে এ-ওষুধ অন্য কারও হাতে পড়লে আর কাজ হবে না!

কামাউয়ের কুঞ্চিত। বলল, মনে রেখো আমিও মন্ত্রট জানি। আমার হাতে ওষুধের গুণ নষ্ট হবে কেন?

হবে হবে। সুনন্দ বলে। তুমি তো আর আমাদের গুরুর কাছে মন্ত্র নাওনি। কামাউয়ের মুখে অবিশ্বাস। বলল, বেশ দেখি পরীক্ষা করে। দাও তোমাদের ওষুধ।

উত্তম। সুনন্দ তাঁবুর ভিতর ওষুধ আনতে যায়।

আমি ও মামাবাবু চুপচাপ শুনছিলাম। সুনন্দটা তো আচ্ছা প্যাচালো বুদ্ধি রাখে। মামাবাবুর মুখে চাপা হাসি।

সুনন্দ ফিরে এসে দুটো বড়ি কামাউয়ের হাতে দিল, কি, কোনো রুগী আছে নাকি হাতে? তাহলে এখুনি খাইয়ে দেখতে পারো।

কামাউ বলল, আছে।

দীর্ঘ শরীরটা সামনে ঝুঁকিয়ে, পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে কামাউ হাঁটতে লাগল। আমরা তিনজনও সঙ্গে চললাম।

একটি কুটিরে একজন জ্বরে কাতর হয়ে শুয়েছিল। কামাউ তাকে বড়ি দুটো খাইয়ে দিল। দু-চারবার নিজস্ব মন্ত্রও আউড়াল।

সুনন্দ বলল, কাল জানতে পারবে ফলাফল। আজ চলি।

খেতে খেতে মামাবাবু বললেন, কী দিলে?

মাথাধরার ট্যাবলেট। সাদা, একরকম দেখতে, ধরতে পারেনি।

কাজটা ভালো করলে না। ও কিন্তু তোমার কথায় বিশ্বাস করেনি। বুঝেছে ঠকাচ্ছে। ওষুধ শেখাবার ইচ্ছে নেই। কাল যখন দেখবে জ্বর নামল না, চটে যাবে। আমাদের বিপদে ফেলবার চেষ্টা করবে।

ফুঃ, ঘোড়ার ডিম করবে। ওকে কিছু দিচ্ছি না। ব্যাটা মহা হিংসুটে। যদি যাবার সময় কিছু বাঁচে তো সর্দারকে বরং দিয়ে যাব।

পরদিন দ্বীপের হাসপাতালে গিয়ে দেখি রাত্তিরের সেই লোকটি আমাদের চিকিৎসার অপেক্ষা করছে। তার জ্বর কমেনি, বরং বেড়েছে। তাকে ম্যালেরিয়ার ওষুধ দিলাম।

কামাউ পাশে দাঁড়িয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমাদের কার্যকলাপ দেখছিল। সুনন্দ তাকে হেসে বলল, কী হে, বলেছিলাম না? বিশ্বাস হল তো?

কামাউ উত্তর দিল না। পাঁচন খাওয়া মুখ করে অন্য দিকে দৃষ্টি ফেরাল।

কামাউ যদিও গোপনে এসেছিল আমাদের গুপ্তবিদ্যা জানতে, কিন্তু কথাটা পাঁচকান হতে দেরি হল না। ঐ রুগীই সব্বাইকে বলে দিল তার ব্যর্থতার কাহিনি। ফলে সমাজে কামাউয়ের প্রেস্টিজ বেশ ক্ষুণ্ণ হল।

টোটো খবর দিল কামাউ নাকি আমাদের বিরুদ্ধে লোকজনকে উত্তেজিত করার চেষ্টা করেছে। মাহিন্ডিদের ওষুধ খেও না। ভবিষ্যতে ফল ভালো হবে না।

কিন্তু দুঃখের বিষয় কেউ কান দেয়নি তার কথায়। উল্টে তারা বলেছে, বিদেশিদের মন্ত্রের জোর বেশি। অপদেবতা তাদের ওষুধে তাড়াতাড়ি পালায়। ফলে কামাউয়ের পসার ভীষণ নষ্ট হচ্ছে।

সর্দার নাকি ধমকেছে। বিদেশিদের পিছনে লাগছ কেন? তোমার দৌড় তো দেখলাম এতদিন। খবরদার! ওদের কোনো ক্ষতি করার চেষ্টা করলে তোমাকে আমি আস্ত রাখব না।

কামাউ আমাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে না, ধারে কাছে আসে না। জ্বলন্ত চোখে দূর থেকে তাকায়। ক্ষমতা থাকলে নির্ঘাত ভস্ম করে দিত।

.

০৯.

দেখতে দেখতে ন-টা দিন কেটে গেল। আজ দশ দিনের দিন। কাল আমরা উপকূলে ফিরে যাব।

সকালে সমুদ্রতীরে গিয়ে দেখলাম দুটো বড় বড় ছিপনৌকো সাজানো হচ্ছে। সেগুলোকে জলের ধারে টেনে আনা হয়েছে। নানারকম জিনিস বোঝাই হচ্ছে নৌকোতে। নারকেল, ছোবড়া, শাঁখ, ঝিনুক, কড়ি, হাঙরের দাঁত, পশুচর্ম, প্রবাল প্রভৃতি হরেক রকম তাদের রপ্তানির জিনিস। টোটো বলল, এই সবের বদলে আনা হবে শস্য, কাপড়, লোহার ফলা, সৌখিন গয়নাগাঁটি, নুন।

আমাদের মন খুব উৎফুল্ল হবার কথা, কিন্তু জানি না মন কেমন করছে চলে যেতে।

মামাবাবু একবার বললেন, ইস, এত তাড়াতাড়ি যাব! আমার কাজ তো কিছুই এগোয়নি। দ্বীপের কতটুকু বা সার্ভে হল? এক কাজ কর না, তোমরা চলে যাও, আমি ক-দিন পরে যাব। নৌকো পাঠিয়ে দিও।

আমাদেরও ইচ্ছে করছে না যেতে। দিব্যি রাজার হালে ছিলাম। সুনন্দর আপশোস, নৌকো চালানোটা ভালো করে শেখা হয়নি। বড্ড তাড়াতাড়ি যেন কেটে গেল দিনগুলো।

টোটো শুকনো মুখে ঘুরছে, বেচারার মন খারাপ। বলেছি, বাকি টিনফুড ও বিস্কুটগুলো ওকে দিয়ে যাব। উপকূল অবধি সে অবশ্য আমাদের সঙ্গে যাচ্ছে। সেখান থেকে সুনন্দ : তাকে রান্নার প্রয়োজনীয় মশলাপাতির জোগাড়যন্ত্র দিয়ে দেবে।

তড়িঘড়ি তাকে কতগুলো রান্না শিখিয়েছে সুনন্দ। রান্নার ফরমুলা মুখস্থ করিয়েছে। হাতে-কলমে দেখিয়ে দিয়েছে।

আমি বলেছিলাম, কী দরকার এত ঝাটে! দু-দণ্ডে তো ভুলে মেরে দেবে। তার চেয়ে অনেকগুলো টিনের খাবার কিনে দে।

না না, ওর রান্নার ন্যাক আছে। ঠিক রাঁধবে। সুনন্দ বলে।

বন্দী মাঝি দুজনেরও ব্যবস্থা করেছি। একফাঁকে সর্দারকে বলে রাজি করিয়ে রেখেছি। সর্দার বলেছে, বেশ, যখন তোমরা বলছ ছেড়ে দেব। কিন্তু লোক দুটো চোর। আপাতত বন্দী থাক, যখন যাব, সঙ্গে যাবে।

সুনন্দ বিকেলে বলল, যাই জেনে আসি কখন নৌকো ছাড়বে। সেই বুঝে মালপত্র গোছাব।

সুনন্দ ফিরে এল প্রায় আধ ঘণ্টা পরে। দেখি সে হনহন করে আসছে। চোখ-মুখ লাল। কী ব্যাপার!

আমার সঙ্গে কোনো কথা না বলে সে গটগট করে তাঁবুর ভিতরে ঢুকে প্রায় চিৎকার করে ডাকল, মামাবাবু! মামাবাবু!

মামাবাবু বই পড়ছিলেন শুয়ে শুয়ে। চমকে উঠে বললেন, কী হয়েছে?

সর্দার কী বলছে জানেন? এখন নাকি আমাদের যাওয়া হবে না।

কেন?

কেন সেটা তো স্পষ্ট করে কিছু বলছে না। নানান আবোল-তাবোল বকছে। নৌকোয় জায়গা কম। তোমরা সাতুজন। হেনতেন।

আবার বলছে এত তাড়াহুড়ো কীসের? থাক না আরও কিছুদিন। পরের বারে যাবে। মোট কথা যেতে দেবার ইচ্ছে নেই এবং মতলব বোঝা যাচ্ছে না।

সুনন্দ ভীষণ ক্ষেপে গিয়ে সর্দারের নামে যা-তা বলতে লাগল, ধাপ্পাবাজ, ভণ্ড, মিথ্যেবাদী, ওরাংওটাং। নিশ্চয় ওই কামাউটা দুর্বুদ্ধি দিয়েছে। ওটাই নাটের গুরু। ওকে আমি দেখে নেব...

মামাবাবু চিন্তিতভাবে বললেন, দাঁড়াও দেখে আসি। ঠিক বুঝতে পারছি না। তোমরা বসো, মাথা গরম করে কোনো কাজ হবে না।

মামাবাবু ফিরে এসে বললেন, বুঝলে হে, ম্যালেরিয়া আমাদের ডুবিয়েছে। পরোপকার করতে গিয়ে ফেঁসে গেছি।

মানে?

ম্যালেরিয়ার ভয়ে ওরা আমাদের ছাড়তে চাইছে না। ওদের ধারণা আমরা চলে গেলে হোমার হাত থেকে কে রক্ষা করবে?

কিন্তু আমাদের ওষুধ তো দুদিন পরে শেষ হয়ে যাবে, তখন?

বলেছি সে কথা। বলছে, শেষ হলে যেও। ততদিন বাঁচাও।

তার চেয়ে সর্দারের হাতে বাকি ট্যাবলেটগুলো দিয়ে যাই। ওপারে পৌঁছে আরও কিনে দেব। নিজেরাই চিকিৎসা করুক, আমাদের থাকার দরকার কী?

তাও বলেছি। কোনো লাভ হয়নি। তুমিই ভেলকি দেখিয়ে, মন্ত্র, গুরু, এইসব বলে-টলে গণ্ডগোল পাকিয়ে বসে আছ। ওষুধ ওরা ভয়ে ছুঁতেই চায় না। পাছে তার গুণ নষ্ট হয়ে যায়। আর এতে কামাউয়ের কোনো হাত নেই। সে বরং চাইছিল আমরা চলে যাই। আইডিয়াটা সর্দারের মাথায় হঠাৎ খেলেছে। কামাউয়ের কথা শোনেনি।

একটু বুদ্ধি করে বললেন না কেন, নতুন কায়দায় ওষুধ বানিয়ে দেব যাতে ওদের হাত লাগলে গুণ নষ্ট না হয়ে যায়।

তাও বলেছি। কিন্তু ওদের দৃঢ় ধারণা উপকূলে একবার পা দিলে আমরা ঠিক পালাব। কাজেই যতক্ষণ ওষুধ আছে আমাদের আটকাও।

যাকগে মন খারাপ কোরো না। বলেছিলে তো আরও কটা দিন থাকলে হয়। পাকেচক্রে ঘটে গেল।

মামাবাবু দিব্যি নিশ্চিন্ত মনে চলে গেলেও আমরা দুজনে বেশ ভড়কে গেলাম। কটা দিন বেশি থাকতে আপত্তি নেই কিন্তু এভাবে জোর করে আটকে রাখা ভালো চোখে দেখলাম না। ওষুধ ফুরোলে সত্যি সত্যি যেতে দেবে তো, না আবার ফাঁকড়া বের করবে?

সুনন্দের রাগ। ভণ্ডামি করল কেন? ভালোভাবে অনুরোধ জানালেও তো পারত। সর্দারটা মোটেই তেমন সরল লোক নয়, হাড়ে হাড়ে প্যাঁচালো।

পরদিন ভোরবেলা আমাদের নাকের ডগা দিয়ে দুখানা ছিপনৌকো সমুদ্রের জল কেটে তীব্র গতিতে বেরিয়ে গেল। নৌকোয় গেল দশ-বারোজন, বাকিরা তীরে দাঁড়িয়ে বিদায় জানাল। বারবার দেবতার উদ্দেশে প্রার্থনা জানাল, হে ভগবান, ভালোয় ভালোয় যেন ফিরে আসে।

নৌকো দুটি ফিরল পরদিন দুপুর নাগাদ।

সবাই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিল। নৌকো ফিরতেই জয়ধ্বনি দিয়ে উঠল। যাক, সকলে ফিরেছে ভালোভাবে।

দ্বীপের লোক ঝুঁকে পড়ল, দেখি দেখি, কী সওদা এনেছে?

.

১০.

দুপুর থেকেই ঢাক বাজছিল। দুম দুম দুম–

বেলা যত পড়তে থাকে ঢাকের আওয়াজ বেড়ে চলে। দ্বীপের আকাশ-বাতাস ধ্বনিত হতে থাকে, দুম দুম দুম...

বোধহয় কোনো বড় উৎসব আজ।

সন্ধে নামতেই আকাশের গায়ে মস্ত রুপোর থালার মতো পূর্ণিমার গোল চাঁদ উঠল। আমি আর সুনন্দ সমুদ্রের তীরে বেড়াতে গেলাম।

জোয়ারের বেগে সাগর উথাল-পাথাল। বড় বড় ঢেউ নাচছে, তাদের মাথায় ফসফরাসের ঝিকিমিকি। ওপর থেকে গড়িয়ে নামছে তরল রুপোলি জ্যোৎস্নাধারা। নীল-সবুজ জলের সঙ্গে মিশে সে এক অপূর্ব দৃশ্য।

মনে হয় ঐ বুঝি পাতাল রাজ্য। অগাধ জলরাশির নিচে লুকিয়ে আছে অপরূপ পাতালপুরী। এই নির্জন সাগরবেলা থেকে আমরা সরে গেলেই বুঝি জল থেকে উঠে আসবে জলকন্যারা।

পিছনে আমাদের সাদামাটা গাছপালা ভরা দ্বীপটাকে লাগছে রীতিমতো রহস্যময়। গাছের ফাঁকে ফাঁকে ছোপ ছোপ চাঁদের আলো মাটিতে লুটোচ্ছে। মাটি পাথরের রঙ বদলিয়ে দেখাচ্ছে কেমন চকচকে তকতকে। নারকেল গাছগুলির পাতায় পাতায় ঝমাঝম বাজনা। তারা ছায়া দুলিয়ে প্রাণপণে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। কাকে? ঐ জ্যোৎস্নাভরা পূর্ণিমার চাঁদ, না উত্তাল সমুদ্রকে?

খানিকক্ষণ বসে থেকে মনটা ভারি স্নিগ্ধ হয়ে উঠল। কথা কইতে ইচ্ছে করে না। কান পেতে শুনি প্রকৃতিরাজ্যে নানান আনন্দধ্বনি। কতরকম কীটপতঙ্গ ডাকছে মনের খুশিতে। আর অবিশ্রান্ত জলরাশির আনন্দ উচ্ছ্বসিত কলধ্বনি।

চুপচাপ দুজনে বসে থাকি।

ফিরে আসতে মামাবাবু বললেন, আজ জমজমাট ব্যাপার। কী ঢাক বাজছে! শুনলাম, ওদের মুঙ্গু অর্থাৎ দেবতাকে আজ বের করবে। জানো তো, সোয়াহিলি ভাষায় মুঙ্গু মানে দেবতা। চলো দেখে আসি।

সুনন্দ বলল, আমি যাব না। তার বিরক্তি কাটেনি।

আমার মনটা কিন্তু উৎফুল্ল হয়ে উঠেছে। দ্বীপের আনন্দ উৎসবে যোগ দিতে ইচ্ছে করছিল, কিন্তু সুনন্দকে ফেলে যাই কী করে? অতএব আমিও বললাম, থাক, আজ যাব না। তখন মামাবাবু একলাই গেলেন।

রাত্রে আবার কিছুক্ষণ সমুদ্রতীরে এসে বসি। তরঙ্গের কলরোল ছাপিয়ে সমানে কানে আসছে ঢাকের দুম দুম দুম...। মাঝে মাঝে অট্টরোল। কুটিরবাসী মুঙ্গুকে এরা সহজে বের করে না। চোখেই দেখিনি তাকে! ইস, সুনন্দ না বেঁকে বসলে যাওয়া যেত।

বিকেলে দেখেছি নাচিয়েরা নানারকম সাজপোশাক করে প্রস্তুত হচ্ছে। কত রকম মুখোশ, বিদঘুঁটে সাজ।

তাঁবুতে ফিরে এসে শুয়েছি। ঢাকের বাদ্যিতে ঘুম আসা দায়। সুনন্দ তো দিব্যি নাক ডাকাতে লাগল। এপাশ ওপাশ করছি, হঠাৎ দেখি মামাবাবু ফিরে এলেন।

তিনি শুলেন না। তাঁবুর মধ্যে একটু খুটখাট করেই আবার বেরিয়ে গেলেন। কী দরকার কে জানে! তারপর কখন ঘুমিয়ে পড়েছি।

পরদিন মামাবাবুকে কিঞ্চিৎ গম্ভীর দেখলাম। অন্যমনস্কভাবে কী জানি ভাবছেন।

অবশ্য দৈনন্দিন প্রোগ্রামে কোনো বদল হয়নি। যথারীতি সকালে ম্যালেরিয়ার চিকিৎসা করেছেন। তারপর বনে-বাদাড়ে ঘুরে বেড়িয়েছেন। দুপুরে বই পড়েছেন। স্পেসিমেন সাজিয়েছেন। তবে কথাবার্তা বলছেন কম।

তার এই ভাবটা সুনন্দরও চোখে পড়েছিল। বলল, কী ব্যাপার রে?

বললাম, কিছু বুঝছি না।

পরদিন মামাবাবুর মুড ঐ একই খাতে বইল।

একটা নতুন জিনিস লক্ষ করলাম, তার বই পড়ার সময় বেড়েছে। ব্যস্তভাবে এ-বই সে-বই ঘাঁটছেন।

সাধারণত প্রাণিবিজ্ঞানের কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে মাথা ঘামালে তিনি সুনন্দর সঙ্গে আলোচনা করেন। কিন্তু এ দুদিন সুনন্দকে তিনি মোটেই আমল দিলেন না।

আমার মন বলছিল কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে!

তৃতীয় দিন চা-পানের পর। এবার আমাদের দৈনিক ডিউটি দ্বীপের হাসপাতালে যাওয়া। যদি কোনো রুগী থাকে।

সেদিন মামাবাবুর গাত্রোত্থানের কোনো লক্ষণ দেখলাম না। বেশ নিশ্চিন্ত মনে গাছের তলায় পা ছড়িয়ে খুঁড়িতে ঠেসান দিয়ে বসে বই পড়ছেন।

আমাদের কী? যাই, নৌকো চাপি। গুটিগুটি উঠছি, একজন লোক এসে দাঁড়াল।

লোকটাকে চিনি, সর্দারের এক পার্শ্বচর। বলল, শীগগির চলো। সর্দারের ছেলের হোমা হয়েছে। গা তেতে, পুড়ে যাচ্ছে। সবাই তোমাদের জন্য সেই কুটিরের সামনে অপেক্ষা করছে। যাচ্ছ না দেখে সর্দার আমায় ডাকতে পাঠাল। চলো চলো–

আমি ও সুনন্দ দাঁড়িয়ে পড়ি। দূর ছাই অযাত্রা কোথাকার! মামাবাবু একা যাবেন, না আমাদেরও সঙ্গে যেতে হবে ভাবছি, এমন সময় মামাবাবুর গম্ভীর গলা শুনতে পেলাম, যাইনি, কারণ গেলে কোনো লাভ হত না। আমাদের ওষুধে সর্দারের ছেলে বা অন্য কোনো কাঁপুনি রুগীই আর সেরে উঠবে না।

তার মানে? লোকটির চক্ষু বিস্ফারিত হয়ে যায়।

মানে ওষুধের গুণ নষ্ট হয়ে গেছে। ওষুধ যখন বানানো হয় তখন একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য তার মধ্যে শক্তি সঞ্চারিত করা হয়। সেই সময় পেরিয়ে গেলে ওষুধ হয়ে পড়ে প্রাণহীন, অকেজো। আমাদের ওষুধে কাল অবধি শক্তি ছিল, আজ ঐ বড়িগুলোর শক্তি মৃত। বড়িতে আবার নতুন করে শক্তি ফিরিয়ে আনতে হবে। পুজো-আর্চা করতে হবে। অনেক সরঞ্জাম চাই। সেসব এখানে পাব কোথায়? তুমি সর্দারকে বলো, ছেলের জন্যে কামাউকে ডাকতে। আমার দ্বারা হবে না।

লোকটা এক মুহূর্ত না দাঁড়িয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ল।

আমরা দুজন হতভম্ব। এ কী কাণ্ড! মামাবাব হাঁড়িপানা মখ করে বসে আছেন। তাকে কিছু জিজ্ঞেস করার সাহস হচ্ছে না। দেখা যাক কী ঘটে।

দূরে দেখা গেল সর্দার আসছে। সদলবলে হন্তদন্ত হয়ে।

সে এসেই উত্তেজিত স্বরে বলল, কী ব্যাপার? শুনলাম নাকি ওষুধ দেবে না? ওষুধের শক্তি শেষ হয়ে গেছে! পুজোটুজো করতে হবে?

হ্যাঁ, ঠিকই শুনেছ।

তবে বসে আছ কেন, পুজো লাগাও। কী কী লাগবে বলো, কটা বলি? এক্ষুনি আনিয়ে দিচ্ছি। মন্ত্র-টন্ত্র তোমাদের জানা আছে তো?

হ্যাঁ, তা আছে কিন্তু যে বস্তুটি নইলে হাজার মন্ত্র পড়েও কাজ হবে না, ওষুধে একফোঁটা শক্তিও ফিরিয়ে আনা যাবে না, সে জিনিসটি এখানে কই?

কী সে জিনিস?

একটি দৈবশক্তিসম্পন্ন পাথর। সেটা আছে আমাদের দেশে। সেরকম পাথর না পেলে শুধু মন্ত্র পড়ে কী হবে? বরং কামাউয়ের ওষুধ খাওয়াও তোমার ছেলেকে।

ধুত্তেরি! এ কামাউয়ের কম্ম নয়। ভীষণ জ্বর, ওর সাধ্য নেই এমন রুগীকে সারায়। এত জ্বরে কামাউয়ের ওষুধ খাওয়ানো হলে দেখেছি রুগী প্রায়ই সারেনি। মরে গেছে। তোমরা যাহোক কিছু ব্যবস্থা করো।

কী আর করব? মামাবাবু হতাশ কণ্ঠে জানান।

অমন জাঁদরেল সর্দার হাউমাউ করে প্রায় কেঁদে ফেলল, ওঃ, কী হবে! আমার অমন জোয়ান ছেলেটা বেঘোরে মরবে নাকি? ও যে আমার সেরা ছেলে। কী কব্জির জোর! কী বর্শার তাক! উৎসবের দিন থেকে জ্বর হয়েছে। আমাকে বলেনি। ওষুধ খায়নি। বন্ধুদের

বলেছিল, ও আপনি সেরে যাবে। এখন উঠতে পারছে না। চোখ দুটো রক্তের মতো লাল, শুধু গোঙাচ্ছে, ছটফট করছে। থরথর করে কাঁপছে। ধরে রাখা যাচ্ছে না। গায়ে হাত দেওয়া যায় না, এত তাত! ওঃ! ওঃ!।

সর্দারকে দেখে আমার কষ্ট হচ্ছিল। কিন্তু মামাবাবু নির্বিকার। শুধু মাথা দুলিয়ে বললেন, তাই তো! আহা, তোমার অমন ছেলেটা!

সর্দার বলল, খুঁজে দেখেছ এ-দ্বীপে তেমন কোনো পাথর আছে কিনা।

না, তা দেখিনি অবশ্য। মামাবাবু বলেন।

বেশ, বলো কীরকম দেখতে। দ্বীপের সমস্ত লোক যত রাজ্যের পাথর আছে তোমার। সামনে হাজির করবে। দেখ পাও কিনা।

না না, আমার কাছে পাথর আনতে হবে না। আর সে পাথর কি বাইরে থেকে দেখে চেনা যায়? আচ্ছা আমি গণনা করে দেখছি, যদি তেমন কোনো পাথর থাকে, ঠিক জানতে। পারব। কোথায় আছে তাও জানব। কিন্তু যদি না থাকে তো আমি নিরুপায়।

দেখ, দেখ শীগগির। সর্দারের ধৈর্য আর বাঁধ মানে না।

বেশ। মামাবাবু উঠে দাঁড়ান। হাঁক পাড়েন, সুনন্দ, তাঁবু থেকে দাবার বোর্ড আর গুটি নিয়ে এস তো।

সুনন্দ বোর্ড আর গুটির বাক্স নিয়ে এল।

মামাবাবু বললেন, সাজাও। এক দান খেলা যাক।

সত্যি খেলবেন? সুনন্দ ভয়ে ভয়ে বলে।

নিশ্চয়। মামাবাবু বসে পড়ে গুটি সাজাতে থাকেন।

সুনন্দ আমার দিকে আড়চোখে তাকায়। তার চোখে কৌতুক ঝিলিক দিয়ে ওঠে।

খেলা আরম্ভ হয়।

সবাই হুমড়ি খেয়ে পড়ে দুজনকে ঘিরে। স্তম্ভিত বিস্ময়ে দেখতে থাকে খোপ খোপ ঘর কাটা বোর্ড। অদ্ভুত দেখতে গুটিগুলো।

আমিও হাঁ করে দেখছি। হঠাৎ এমন সাড়ম্বরে দাবা খেলার শখ কেন মামাবাবুর? গভীর উদ্দেশ্য একটা আছে নিশ্চয়, কিন্তু রহস্যটা কী? মাথামুণ্ডু কিছুই ধরতে পারছি না। গম্ভীর মুখে মামাবাবু চাল দিচ্ছেন।

মামাবাবু দুর্ধর্ষ দাবাড়ু। সুনন্দ কতক্ষণ টিকবে তার সামনে? তারপর ব্যাপার-স্যাপার দেখে সে নার্ভাস। দেখতে দেখতে বোড়ে, ঘোড়া, গজ ইত্যাদি ঝপাঝপ কাটা পড়তে লাগল। পাঁচ মিনিটে মাৎ। সুনন্দর রাজাকে নিয়ে মামাবাবু চেঁচিয়ে উঠলেন সোয়াহিলিতে, পেয়েছি, পেয়েছি। ইউরেকা! হা হা, আছে। এই দ্বীপেই আছে। সেরকম এক দৈবশক্তি সম্পন্ন পাথর। তার সাহায্যে আমার ওষুধের গুণ ফিরিয়ে আনা সম্ভব।

কোথায়? কোথায়? সমস্ত জনতা চিৎকার করে ওঠে।

দাঁড়াও সেটা গুণে দেখি।

মামাবাবু এবার পকেট থেকে বের করলেন একখণ্ড সাদা কাগজ। মাটিতে বিছিয়ে পাতলেন। তারপর পেন ঘুলে খসখস করে এঁকে চললেন বৃত্ত, ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ, পঞ্চভূজ–যত রাজ্যের জ্যামিতিক নকশা।

মাঝে মাঝে বিড়বিড় করছেন। কখনো কী গুণছেন। সবাই গোল গোল চোখ করে দেখছে। দারুণ টেনশন।

হঠাৎ তিনি বলে ওঠেন, ই পেয়েছি। কাগজের ওপর চোখ রেখে তিনি জোরে জোরে হিসেব করেন–চত্বরের পুব-দক্ষিণ কোণ বরাবর পঞ্চাশ হাত। একটা ছোট কুটির। কেউ থাকে না তাতে। না না ভুল হল, থাকে। তবে মানুষ নয়। মূর্তি। এ হচ্ছে তোমাদের মুঙ্গুর কুটির। ভিতরে আছে পাথরটা।

মুঙ্গুর কুটিরের ভিতর? সর্দার আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করে।

হ্যাঁ, কালো রঙের বেশ বড় পাথর।

কই সেরকম কোনো পাথর তো নেই কুটিরে। একজন বলে।

নেই? মামাবাবু অবাক হন। আবার কয়েকবার আঁচড় কাটেন কাগজে। তারপর বলেন, আচ্ছা, তোমাদের মুঙ্গু কী দিয়ে তৈরি? পাথরের? কালো রঙ, চৌকো গড়ন?

হ্যাঁ হ্যাঁ।

মামাবাবুর মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। ব্যস, তবে ঐ মুহূকে আমার চাই। মুই একমাত্র পারে আমার ওষুধের গুণ ফিরিয়ে দিতে। আর কোনো তেমন পাথর নেই এখানে। মুঙ্গুর

সামনে আমি পুজো করব। মন্ত্র পড়ব। তারপর ওষুধ ছোঁয়াব তার গায়ে। অমনি ওষুধে। আবার নতুন প্রাণ পাবে। সেই ওষুধ খেলেই সর্দারের ছেলে চাঙ্গা হয়ে উঠবে।

সমস্ত জনতা কেমন আড়ষ্ট অসাড় হয়ে যায়। কারো মুখে কোনো কথা নেই। এ ওর দিকে তাকাচ্ছে।

বুঝলাম কোথাও একটা গরমিল হয়ে গেছে।

ভেবেছিলাম মুঙ্গুর নাম শুনেই সর্দার হুকুম দেবে–লে আও মুকে। আভি। কিন্তু এই দ্বিধা কেন? প্রস্তাবটি কাজে পরিণত করতে কোথায় যেন বাধা আছে।

সর্দার এগিয়ে এল। আমতা আমতা করে বলল, কিন্তু মূহুর সামনে পুজো হবে কী করে? বিদেশিদের পক্ষে এই দেবতাকে দর্শন যে বারণ। নিষিদ্ধ।

মামাবাবু আশ্চর্য হয়ে বলেন, তাই নাকি! বিশেষ কারণেও দেখা চলবে না?

না।

তাহলে আমি নিরুপায়। মামাবাবু উদাসভাবে মুখ ফেরান। তোমার ছেলের জন্য আমার দুঃখ হচ্ছে। বেচারার দেখছি নেহাতই প্রাণটা যাবে। কী কড়া তোমাদের নিয়ম! দেখো

ভেবে, কোনো রকমেই কি সম্ভব নয় মুম্বুর সামনে আমার পুজো করা? তাহলে ছেলেটা বাঁচত।

না না না। এ অসম্ভব। একেবারে অসম্ভব। একটা তীক্ষ্ণ, তীব্র গলা মামাবাবুর কথা শেষ করতে দেয় না।

সচকিতে তাকিয়ে দেখি কামাউ।

তার দীর্ঘ বাঁকানো শরীরটা উত্তেজনায় সোজা হয়ে উঠেছে। চোখ দুটো ধকধক করে জ্বলছে রাগে।

অপবিত্র বিদেশির দৃষ্টি মুঙ্গুর গায়ে লাগলে সর্বনাশ হবে। ধ্বংস হয়ে যাবে সবাই।

কামাউ সর্দারের উদ্দেশে চেঁচিয়ে বলে, মাহিন্ডির শয়তানি। ওরা আমার দেবতাকে অপমান করতে চায়।

মামাবাবু সঙ্গে সঙ্গে জিভ কেটে হাতজোড় করেন, আরে ছি ছি! তোমার পবিত্র মুঙ্গুকে অপমান করতে কি পারি? মুঙ্গুকে দেখা নেহাত যদি নিষিদ্ধ হয় তবে থাক। কিন্তু এও শোনো সর্দার–আমরা সাধারণ বিদেশি নই। অনেক শক্তি আমাদের। অনেক মন্ত্র জানি। তার প্রমাণ তো তোমরা পেয়েছ, বিদেশির দৃষ্টি গায়ে লাগলে মুঙ্গ যাতে অসন্তুষ্ট না হন

তার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা আমরা করব। পুজো দেব। তোমরাও ভালো করে পুজো লাগিও তার রাগ কমাতে। আমি নিশ্চিত জানি সর্দারের প্রিয় ছেলের প্রাণরক্ষার চেষ্টা করতে এই সামান্য নিয়মভঙ্গ হলে মুঙ্গু অপরাধ নেবেন না। দ্বীপের কারো কোনো ক্ষতি হবে না। এখন তোমরা ভেবেচিন্তে কী করতে চাও–

মামাবাবু কলমটা পকেটে গুঁজলেন। সযত্নে বৃত্ত, ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ অঙ্কিত জ্যোতিষচর্চার নিদর্শন কাগজটি ভাঁজ করে পকেটে রাখলেন, তারপর গালে হাত দিয়ে উদাস হয়ে বসে রইলেন।

দাবার গুটি বোর্ড সুনন্দ ইতিমধ্যে গুছিয়ে ফেলেছিল।

দেখি, কামাউয়ের মুখ আক্রোশে বিকৃত হয়ে উঠেছে। মুঙ্গুর সম্মান রক্ষা করতে সে বদ্ধপরিকর।

সর্দার দ্বিধাগ্রস্ত। ধর্মবিশ্বাস ও প্রিয় ছেলের প্রাণ, এই দোটানায় দুলছে তার হৃদয়। সর্দার কামাউয়ের দিকে এগিয়ে গেল। সমস্ত ভিড়টা তাদের ঘিরে ধরল।

সর্দার ও কামাউয়ের মধ্যে কথা আরম্ভ হল। বুঝলাম, কামাউ সম্মতি দিলেই সর্দার আমাদের মুঙ্গুর সাক্ষাতে হাজির করবে।

প্রথমে নিচু স্বরে কথাবার্তা হচ্ছিল, কিন্তু ক্রমে দুজনের গলাই চড়তে থাকে। কামাউয়ের এক কথা বার বার কানে আসছিল, আপানা আপানা, অর্থাৎ না না।

সর্দারের মেজাজও গরম হচ্ছিল।

অন্যদের হাবভাব দেখে মনে হল তারাও সর্দারের পক্ষে। অসুস্থ ছেলেটি তাদের পরম প্রিয়। তার প্রাণ বাঁচাতে তাদের আগ্রহ বেশ বোঝা যাচ্ছিল। তাছাড়া মুঙ্গুর মেজাজ শান্ত করতে যে দাওয়াই মামাবাবু বাতলেছেন সেটাও তাদের মনে ধরেছে। কামাউয়ের চেয়ে আমাদের শক্তির ওপরই তাদের বেশি আস্থা।

মিনিট দশেক পর সর্দার গটগট করে আমাদের সামনে এসে দাঁড়াল। গম্ভীর স্বরে বলল, আমি আদেশ দিচ্ছি, যাও তোমরা মুঙ্গুর সামনে পুজো আরম্ভ করো। কেউ বাধা দিতে এলে তার মাথাটা আর ধড়ের ওপর আস্ত থাকবে না, মনে রেখো।

মুখ ঘুরিয়ে সর্দার কামাউ এবং তার গুটিকতক ভক্তকে ক্রুদ্ধ চোখে দেখে নেয়।

কামাউ তখন রাগে ফুলছে। চিৎকার করে অভিশাপ দিচ্ছে, সবংশে নিপাত যাবি।

মুঙ্গু কাউকে রক্ষা রাখবে না। শয়তান বিদেশিগুলোকে এখুনি খতম কর। কী, তোরা দাঁড়িয়ে দেখছিস কী? বাধা দে।

কিন্তু কেউ বাধা দিল না। প্রতিবাদ করল না। কামাউয়ের দুই চেলা ত্যাড়া-বাকা পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছিল। কিন্তু তারাও এগোলো না।

উঃ অসহ্য! নিষ্ফল ক্রোধে ফুলতে ফুলতে কামাউ দ্রুত পায়ে সেই স্থান ত্যাগ করে চলে গেল।

সর্দার বলল, কী কী দরকার বলো, আনিয়ে দিচ্ছি।

মামাবাবু বললেন, থাক, আমরা নিজেরাই জোগাড় করে নেব! তারপর গলা নামিয়ে আশ্বাসের সুরে বললেন, কিছু ঘাবড়িও না। মুত্যুকে আমি ঠিক ম্যানেজ করে দেব। চটবে না।

সুনন্দ শীগগির বেশ কিছু নারকেল ছোবড়া জোগাড় করো। আর একটা পাত্র। ধোঁয়া দিতে হবে।

কার বুদ্ধির গোড়ায় কে জানে! আমার কানে ফিসফিসিয়ে কথা কটা বলে সুনন্দ, এই যাচ্ছি মামাবাবু! বলে একলাফে এগোলো।

মুঙ্গুর মন্দিরের দরজায় চাপা কাঠের তক্তাটা আগে থাকতেই ভোলা ছিল। মন্দিরের কাছে পৌঁছে মামাবাবু অর্ডার দিলেন, এবার ছোবড়ায় আগুন লাগাও। খুব ধোঁয়া হয় যেন।

একটা হাতলওলা স্টিলের ডেকচি ঠেসে নারকেল ছোবড়া ভরা হয়েছিল। সুনন্দ লাইটার জ্বেলে আগুন দিল। তারপর দুজনে ফুঁ দিয়ে দিয়ে ধোঁয়ার মেঘ তৈরি করে ফেললাম।

মামাবাবু হঠাৎ হাঁ রে রে রে বলে বিকট এক হুঙ্কার ছাড়লেন। তারপর দরজার মুখে গিয়ে দাঁড়ালেন। আমাদের বললেন, আমি ভিতরে ঢুকছি। তোমরা দরজার মুখে বসে পড়ো। খুব ধোঁয়া ওঠাও আর যা ইচ্ছে মন্ত্র আওড়াও। জোরে জোরে।

মন্ত্র! কীসের মন্ত্র?

আহা, ঐ কবিতা-টবিতা যা হয় কিছু। বাংলা, ইংরেজি, সংস্কৃত যা মনে আসে। থামবে । এই বলে তিনি দৃঢ় পদক্ষেপে মুজুর মুখোমুখি হলেন।

একনজরে একবার দেখে নিলাম মুঙ্গুকে।

ঘরটার সামনে তখন সমস্ত দ্বীপের বাসিন্দা এসে জড়ো হয়েছে। থমথমে আবহাওয়া। মুহূকে বিদেশি চর্মচক্ষে দেখল–না জানি কী অঘটন ঘটবে। বজ্রপাত না ভূমিকম্প! এক অজানিত আশঙ্কায় তাদের হৃদয় আচ্ছন্ন। মুখগুলো বিবর্ণ। চোখে ভয় বিস্ময়।

বুঝছি যে সমস্ত ব্যাপারটায় এক বিরাট প্যাঁচ খেলছেন মামাবাবু। কিন্তু কেন? উদ্দেশ্য কিছু ধরতে পারছি না। জিজ্ঞেস করারও উপযুক্ত সময় নয় এটা। অতএব প্রতীক্ষা করা যাক। ধীরে ধীরে সব রহস্যই উঘাটিত হবে।

সুনন্দকে বললাম, আমি বাংলা চালাচ্ছি, তুই দেবভাষা ঝাড়।

অলরাইট! সংস্কৃতে আমার লেটার ছিল ম্যাট্রিকে, শুনবি?

দুজনে আচমকা এমন বিটকেল হেঁড়ে গলায় আওয়াজ ছাড়লাম যে সামনের লোকগুলো চমকে সাত হাত পিছিয়ে গেল। দুটো তালপাতার পাখা দিয়ে প্রাণপণে ধোঁয়া ওড়াই আর মুঠি পাকিয়ে কী ভীমবিক্রমে কাব্যপাঠ। বোধহয় একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছিল কারণ ভিতর থেকে মামাবাবুর চাপা স্বর শুনলাম, একটু আস্তে।

ঝাড়া পনেরো কুড়ি মিনিট চিৎকার করে গলাটা আমার ধরে এল। দম নিতে থামলাম।

মামাবাবু কী করছেন? কৌতূহলী হয়ে পিছনে তাকালাম।

ভীষণ অবাক হয়ে দেখলাম তিনি সেই অদ্ভুতদর্শন বিগ্রহের পরে ঝুঁকে পড়েছেন। হাতে একটা ম্যাগনিফাইং গ্লাস। গ্লাসে চোখ লাগিয়ে কী দেখছেন। একেবারে তন্ময়। পাশে

মাটির ওপর খোলা একখানা সাদা কাগজ, কী সব ছবি আঁকা। একটা পেন্সিল মাটিতে পড়ে।

একটা নিচু মাটির বেদির ওপর শিলের মতো একখণ্ড কালচে পাথর চিৎ করে শোয়ানো। পাথরের ওপর খোদাই করা এক মূর্তি। প্রায় হাতখানেক লম্বা। মানুষের মূর্তি নয় এটুকু বুঝলাম। কোনো জন্তু বা কোনো কাল্পনিক বস্তু। অদ্ভুত আকৃতি।

আমার দেখাদেখি সুনন্দও পিছনে তাকিয়েছে। দুজনেরই চিৎকার বন্ধ হয়ে গেছে।

মামাবাবু মুখ তুললেন, কী ব্যাপার? দেখলেন, আমরা হাঁ করে তাকিয়ে আছি। আঙুল নেড়ে ডাকলেন, দেখে যাও।

ধুনুচিটা দরজার গোড়ায় রেখে আমরা পায়ে পায়ে যাই।

এবার স্পষ্ট করে খুঁটিয়ে দেখলাম।

উপাস্য বিগ্রহ যে এমন ভয়াবহ বিকট হতে পারে ধারণাই ছিল না। উপজাতিদের কাণ্ডকারখানাই আলাদা! এটাকে কী বলব? কোনো জন্তু? না। মনে হল কোনো টিকটিকি বা গিরগিটি জাতীয় জীবের কঙ্কাল যেন পাথরের ওপর সেঁটে দেওয়া হয়েছে। আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই স্মৃতি-কোঠায় একটি বর্ণনা বিদ্যুতের মতো চমক দিয়ে যায়।

জঙ্গলের মধ্যে আগুন ঘিরে অসভ্য আদিবাসীদের উৎসব হচ্ছে। আগুনের পাশে রাখা হয়েছে এক মূর্তি–বিচিত্র। বীভৎসাকৃতি। আর দুর থেকে লুকিয়ে দূরবীন চোখে দেখছে– বিল। ডেয়ারিং বিল।

মামাবাবু বললেন, মনে পড়েছে কারো কথা?

হা হা। দুজনে প্রায় একসঙ্গে বলে উঠি।

আমার মনে হয় এটা সেই মূর্তি। সেই দেবতা। কিন্তু কী বস্তু এটা বুঝতে পেরেছ? প্রশ্নটা তিনি করেন সুনন্দকে।

এ তো খোদাই করা মূর্তি নয়। ফসিল। সুনন্দ বলে।

কারেক্ট। কিন্তু কীসের?

কোনো সরীসৃপের বোধহয়। গিরগিটি বা কুমীরের ছানা।

তোমার মুণ্ডু। মামাবাবু চাপা গলায় ধমকে ওঠেন। সুনন্দ থতমত খেয়ে যায়।

ব্যস ব্যস, দেখা হয়েছে। এবার তোমাদের ডিউটি করো। দরজায় লোক উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে। বেশিক্ষণ নয়, আর পাঁচ মিনিট। আমি স্কেচটা শেষ করে নিই।

এক অজানিত রহস্যের গন্ধে আমার মন আনচান করে ওঠে। খোদাই করা মূর্তি, না ফসিল! সুনন্দের প্রাণিবিজ্ঞান চর্চা করা চোখ সেটুকু আবিষ্কার করতে ভুল করেনি। কিন্তু কীসের? সুনন্দও ভুল করেছে। যাক আপাতত মামাবাবুর কথামতো আবার মন্ত্রপাঠ আরম্ভ করি। ধোঁয়া ওড়াই।

উত্তেজনার বশে এবার আমি ধরেছি ইংরেজি আর সুনন্দ বাংলা।

পাতার পর পাতা হ্যামলেট বলে যাচ্ছি। দু-এক টুকরো অভিনয়ও দেখাচ্ছি সামনের স্তম্ভিত মুগ্ধ দর্শকবৃন্দকে। কলেজ লাইফে অসিত রায় হ্যামলেট করে মেডেল পেয়েছিল। সুনন্দ আউড়াচ্ছে নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ। এক কবিতাতেই পাঁচ মিনিট কাবার করে দেবার মতলব।

সহসা যবনিকা পতন।

পিছন থেকে মামাবাবুর গলা পেলাম, ব্যস, থামো এবার। চলো, সর্দারের ছেলেকে দেখতে যাই।

তাঁবুতে ফেরার পথে মামাবাবুকে দেখলাম চুপচাপ, অন্যমনস্কভাবে পথ চলছেন। ক্যাম্পে পৌঁছে তিনি আমাদের সঙ্গে একটি কথা না বলে বই হাঁটকাতে আরম্ভ করলেন। দেখলাম, মুঙ্গুর ছবিটা পিচবোর্ডের ওপর ক্লিপ দিয়ে আটকে পাশে রেখেছেন।

এরকম গুরুগম্ভীর ভাবগতিক দেখে আমার প্রশ্ন-টশ্ন করার সাহস উবে গেল। যদিও প্রচণ্ড কৌতূহল। নিজেদের মধ্যে নিচুস্বরে কথা কই। বাইরে রান্নার জোগাড়যন্ত্র করি আর লুকিয়ে লুকিয়ে দেখি মামাবাবুর হালচাল।

একদফা চা হল।

মামাবাবুকে দিলাম এক কাপ। মুখ না তুলেই তিনি কাপ নিলেন।

চারদিক নিস্তব্ধ! শুধু টুপটাপ পাতা ঝরার শব্দ। টুংটাং বাসনের আওয়াজ। সুনন্দকে জিজ্ঞেস করি, হারে, ওটা বুঝি খোদাই করা মূর্তি, না ফসিল?

হ্যাঁ।

দেখতে কিন্তু অবিকল খোদাই করা মূর্তির মতন। যেন পাথর কুঁদে একটা কঙ্কাল তৈরি করেছে কেউ।

হুঁ, পুরো দেহটা কাদায় পড়ে ডুবে যায়। তারপর প্রাণিদেহের নরম অংশগুলো গলে গিয়ে পুরো হাড়ের অংশটুকু জমে শক্ত পাথর হয়ে গেছে। আর যে কাদায় ডুবেছিল সেই কাদায় হয়েছে কাদা পাথর। দেখলি না পাথরটার রঙ কালো কিন্তু মূর্তিটার রঙ সাদাটে। দুটো তো এক পাথর নয়।

কিন্তু কীসের ফসিল?

সেইটেই তো ধরতে পারছি না! সুনন্দ চিন্তিত স্বরে বলে।

দু-ঘন্টা কেটে গেছে।

রান্না তৈরি। আজ সুনন্দ বানিয়েছে ভুট্টার ছাতুর সঙ্গে মাংস মিশিয়ে সুরুয়া, নুন মাখানো সিদ্ধ ধুঁধুল। কাছিমের সিদ্ধ ডিম এবং সামুদ্রিক শ্যাওলা।

এই শ্যাওলা মামাবাবুর আবিষ্কার। সমুদ্রের ধারে পাথরের খাঁজে দেখেই বলেছিলেন, এ শ্যাওলা আমি খেয়েছি, জাপানে। খুব উপকারী। অতএব আমরাও খাচ্ছি, কাঁচাই। ভালো করে ধুয়ে নিয়ে সামান্য টমাটো সস মাখিয়ে। আমার তত উপাদেয় ঠেকে না, কিন্তু সুনন্দ খুব ভক্ত হয়ে পড়েছে।

মামাবাবুর সাড়াশব্দ নেই। খেতে ডাকা উচিত হবে কি না ভাবছি। এমন সময় ডাক শুনলাম, সুনন্দ শুনে যাও। অসিত তুমিও এসো।

দুজনে এক ছুটে তাঁবুর ভিতরে ঢুকলাম।

দেখি, মামাবাবু মাটিতে কম্বল পেতে বসে, সামনে একখানা খোলা বই। পাশে বিছানো রয়েছে সেই স্কেচটা বইয়ের যে পাতা খোলা সেটার পাতা জোড়া কোনো ফোটোগ্রাফের ছবি। কোনো অদ্ভুত আকৃতির প্রাণী বা প্রাণীর কঙ্কাল।

মামাবাবু বইয়ের ছবিটা দেখিয়ে সুনন্দকে বললেন, চিনতে পারো? এখন মিলিয়ে দেখ এর সঙ্গে এদের দেবতাকে।

সুনন্দ তাকিয়ে রইল। এক-দুই...প্রায় দশ সেকেন্ড। চোখের পলক পড়ছে না। তারপরই সে চেঁচিয়ে ওঠে, আর্কিঅপটেরিক্স! এ তবে আর্কিঅপটেরিক্স-এর ফসিল?

না। মামাবাবু মাথা নাড়েন। আমিও প্রথমে তাই ভেবেছিলাম। ভালো করে পরীক্ষা করো। তফাত ধরতে পারছ?

আমি তখন বইয়ের ছবি খুঁটিয়ে দেখছি–

কোনো জীবন্ত প্রাণী নয় বুঝলাম, ফসিলের ছবি। পাথরের গায়ে কোনো প্রস্তরীভূত কঙ্কাল। দেহের রক্তমাংস মাটির তলায় চাপা পড়ে গেছে। শুধু হাড়ের কঙ্কাল জমে পাথর হয়ে গেছে।

লম্বা গলা। ছোট মাথার খুলি। চোয়াল ক্রমশ ছুঁচলো হয়ে গেছে, অনেকটা কুমীরের চোয়ালের মতো গড়ন। চোয়ালের মধ্যে দু-সারি দাঁত দেখা যাচ্ছে। চার পা। সামনের পা দুটো অপেক্ষাকৃত ছোট। বাঁকানো আঙুলের মাথায় তীক্ষ্ণ নখ। প্রাণীটার লম্বা লেজও ছিল। এখন মাংস তো নেই। ছোট ছোট অস্থিখণ্ড জোড়া পাথরের লেজটা দেখতে বীভৎস।

একটা জিনিস দেখে চমকে উঠি। ছবির নিচে লেখা Archaeopteryx (ancient bird)। এই সেই প্রাচীন পাখি–

দেখলে গিরগিটির মতো কোনো সরীসৃপের ফসিল বলেই মনে হয়।

মামাবাবুর হাতে আঁকা মুঙ্গুর ছবির সঙ্গে আরকিঅপটেরিক্স-এর ফসিলের ছবিটা মিলিয়ে দেখলাম, দুই-ই একরকম। অমনি গলা, মাথা, মুখের ভিতর দাঁতের সারি। লম্বা লেজ, চারটে পা, দুটো এক ভাবাই স্বাভাবিক। কিন্তু দুটো যে এক জাতের নয় সে তো কানেই শুনলাম। কিন্তু বইয়ের ঐ ছবি পাখির ফসিল হয় কী করে?

সুনন্দ একদৃষ্টে চেয়ে ভাবছে। একবার বইয়ের ছবি, একবার মুজুর স্কেচটাকে লক্ষ্য করছে।

মামাবাবু নীরব।

মামাবাবু বললেন, এই পাখি জুরাসিক যুগ, অর্থাৎ প্রায় আঠারো কোটি বছর আগেকার জীব। এর চেয়ে প্রাচীন পাখির ফসিল এখনও আবিষ্কার হয়নি।

তখনও এরা পুরোপুরি আধুনিক পাখি হয়ে উঠতে পারেনি। সরীসৃপের অনেক চিহ্ন তখনও তাদের দেহে বর্তমান।

জীবন্ত আরকিঅপটেরিক্স দেখার সৌভাগ্য অবশ্য কোনো মানুষের হয়নি। বৈজ্ঞানিকরা আন্দাজে স্থির করেছেন কেমন দেখতে ছিল সরীসৃপের অতি নিকট-আত্মীয় পক্ষি-জগতের এই আদিপুরুষ।

মামাবাবু বই খুলে একখানা ছবি দেখান—

আরেব্বাস! বলে না দিলে কে একে পাখি ভাববে? ভাবতাম নির্ঘাত সেই রূপকথার ড্রাগন। কঙ্কালের গায়ে মাংস লাগানো হয়েছে। অক্ষিকোটরে বসেছে একজোড়া হিংস্র চক্ষুতারকা। ফাঁক করা ঠোঁটের মধ্যে দু-সারি করাতের মতো দাঁত দেখা যাচ্ছে। পাখির

চিহ্ন বলতে দেখলাম, একজোড়া ডানা। সামনের দু-পায়ের সঙ্গে আটকানো। আর তার পাখায়, লম্বা লেজে বড় বড় মোটা মোটা পালক। পালকগুলো নরম নরম নয়। কেমন শক্ত শক্ত, সোজা সোজা। গায়ে ওগুলো কী? আঁশ, না পালক?

মামাবাবু বললেন, দুই-ই ছিল।

ছবিতে গাছের ডাল আঁকড়ে ঝুলছে পাখিটা।

কত বড় হত এই পাখি? আমি জিজ্ঞেস করি।

বেশি বড় নয়। ধরো এই কাক বা পায়রার সাইজ। কই হে সুনন্দ, কিছু বলছ না যে? মামাবাবু অধীর হয়ে ওঠেন।

না, মানে কয়েকটা তফাত ধরতে পারছি, তবে ঠিক–সুনন্দ আমতা আমতা করতে থাকে।

কি, আমার স্কেচটা বুঝতে কষ্ট হচ্ছে? বেশ এই দেখ।

একটা পেন্সিল নিয়ে উল্টো পিঠ দিয়ে তিনি পয়েন্ট আউট করতে থাকেন।

এই হচ্ছে বার্লিন মিউজিয়ামে যে ফসিলটা রয়েছে তার ফোটো। আরকিঅপটেরিক্স-এর বেস্ট স্পেসিমেন। আমি নিজের চোখে দেখেছি। এখন লক্ষ্য করো, প্রথমে গলা–মুর গলা দেহের তুলনায় অনেক লম্বা এবং সরু। তারপর মাথা।

এই গিরগিটি-অবতারের মাথার খুলি বেশি বড়। চোয়াল চওড়া, দাঁতগুলোও বড় বড়। অর্থাৎ এই প্রাণীর পাখির সঙ্গে আদল আরও কম এবং পূর্বপুরুষ সরীসৃপের অনেক কাছাকাছি।

হ্যাঁ, লেজ দেখ।

এই ফসিলের লেজ বার্লিন ফসিলের তুলনায় কিছুটা লম্বা। আঙুলও এর মোটা মোটা। সোজা সোজা, আরকিঅপটেরিক্স-এর মতো বাঁকানো বাঁকানো নয়। নখ ভোঁতা। ওড়ার চেয়ে হাঁটত বেশি, তাই এইরকম আঙুলের গঠন। যেমন উটপাখির হয়।

ছবি দেখে ঠিক বুঝতে পারবে না। আরকিঅপটেরিক্স-এর ফসিল চোখে দেখলে বুঝতে দ্বীপের ফসিলের সামনের পায়ের হাড় মোটা ও লম্বা। অর্থাৎ তখনও সামনের পা দুটো একেবারে অকেজো হয়ে যায়নি। পরে দিনে দিনে সামনের পা ডানার সঙ্গে জুড়ে ডানার অংশ হয়ে যায়।

আর এই প্রাণী যে আরকিঅপটেরিক্স থেকে পুরনো তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ এর ডানা এবং পালক। মুঙ্গুর ডানাটি এঁকেছি আরকিঅপটেরিক্স-এর থেকে ঢের ছোট। কাদা পাথরের গায়ে ডানার ছাপ স্পষ্ট পড়েছে, হয়তো এই প্রাণী একেবারেই ডানা নেড়ে উড়তে পারত না। মাঝে মাঝে ছুটে এসে দু-ডানা মেলে খানিকক্ষণ বাতাসে ভাসত। অবশ্য আরকিঅপটেরিক্স কিছু ওড়ায় ওস্তাদ ছিল না, আধা-ওড়া আধা-হাঁটার ওপর থাকত বলে অনুমান করা হয়েছে।

মামাবাবু বলেন, এবার লক্ষ করো পালক। সবচেয়ে ইমপর্ট্যান্ট পয়েন্ট। স্কেচটা অবশ্য তেমন নিখুঁত হয়নি, তাড়াহুড়োয় এঁকেছি। আগুনের আভায় মুঙ্গুকে দূর থেকে দূরবিনে দেখে আমিও ভেবেছিলাম আরকিঅপটেরিক্স। অবশ্য একদম প্রথমে আমারও সরীসৃপ বলে ভুল হয়েছিল। তারপরই ডানার ছাপটা লক্ষ করলাম। কিন্তু কুটিরে ঢুকে কাছ থেকে দেখে চমকে গেলাম। একি! আরকিঅপটেরিক্স তো মনে হচ্ছে না–কিছু কিছু অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গড়ন যেন অন্যরকম। পাথরের দেহের কোমল অংশের ছাপ পরীক্ষা করে বুঝলাম এ আরকিঅপটেরিক্স নয়, তার পূর্বপুরুষ। কাদা পাথরে আঁশ এবং পালকের ছাপ পরিষ্কার পড়েছে। দেখলাম এটায় আরকিঅপটেরিক্স-এর তুলনায় পালক অনেক কম, আঁশ বেশি।

আপনি বুঝি লুকিয়ে দেখেছিলেন মুস্তুকে?এতক্ষণে সুযোগ বুঝে আমি প্রশ্ন করি। ঐ জন্যে তাঁবুতে এসেছিলেন রাত্তিরে? দূরবিন নিতে?

হ্যাঁ, বাধ্য হয়ে। শুনলে তো মুঙ্গুকে বিদেশিদের দেখা বারণ। ডেয়ারিং বিলকেও দেখতে দেয়নি। নাচের আসরে যাওয়া মাত্র কামাউ আমাকে ভাগিয়ে দেয়। আমিও ছাড়ব না। তবু থেকে দুরবিন নিয়ে গিয়ে বিলের মতোই আড়াল থেকে লুকিয়ে দেখি। চত্বরের এককোণে পাথরটা খাড়া করা ছিল।

ও তারপরে আরও ভালো করে দেখবার জন্য এই ফন্দি আঁটলেন? সুনন্দ বলে।

হ্যাঁ। মামাবাবু হাসেন। এত সহজে খেটে যাবে প্ল্যানটা ভাবিনি। যাক এ-প্রাণী যে আরকিঅপটেরিক্স থেকে কয়েক কোটি বছরের পুরনো আশা করি তা প্রমাণ হচ্ছে।

মামাবাবু বলেন, আমি এই প্রাণীকে পুরোপুরি পাখি বলব না। আবার পুরোপুরি সরীসৃপও নয়। বলব সরীসৃপ এবং পাখির মধ্যে এটাই হচ্ছে মিসিং লিঙ্ক–হ্যারানো সূত্র। আই ওয়াজ রাইট!

মামাবাবু শেষ করতেই সুনন্দ লাফিয়ে ওঠে, ওঃ এটা যে দারুণ একটা আবিষ্কার হবে মামাবাবু। চারদিকে একেবারে হইচই পড়ে যাবে!

তা একটু পড়বে। তবে আমি সবচেয়ে খুশি হয়েছি কেন জানো?

কেন? সুনন্দ বলে।

এইবার ডক্টর মিলার ধরাশায়ী হবেন। তার ধারণা, পাখি নাকি ইউরোপেই প্রথম হয়েছিল। কারো কথা মানে না। বেজায় দাম্ভিক। ফসিল দেখে বাছাধন কী করবেন তাই ভাবছি।

কিন্তু ফসিল দেখাবেন কী করে? এখান থেকে নিয়ে যাবেন কী উপায়ে? সুনন্দ বলল।

সে নিয়ে পরে মাথা ঘামানো যাবে। আপাতত খেতে দাও। বকবক করে বেজায় খিদে পেয়ে গেছে।

মামাবাবু আশ্চর্য লোক।

অমন উত্তেজনার দিনেও তার দৈনন্দিন প্রোগ্রামে বিন্দুমাত্র ব্যাঘাত হল না। খেয়ে উঠে যথারীতি নিশ্চিতভাবে বই খুলে শুয়ে পড়তে লাগলেন।

আমরা এদিকে ছটফট করছি। কথা বলতে চাইছি, কিন্তু মামাবাবুর যেন ও-বিষয়ে কোনো আগ্রহই নেই। আমি ও সুনন্দ অনেকক্ষণ বিছানায় শুয়ে এপাশ ওপাশ করি। কথা বলতে পারছি না পাছে মামাবাবুর ডিসটার্বেন্স হয়। তবু ফিসফিস করে বললাম, ওঃ মামাবাবু সাংঘাতিক ফেমাস হয়ে যাবে, বুঝলি। মিসিং লিঙ্ক আবিষ্কার! সোজা ব্যাপার?– তারপর কখন ঘুমিয়ে পড়েছি।

ঘুম থেকে উঠে দেখলাম মামাবাবু নেই। সুনন্দ, ভোঁস ভোঁস করে ঘুমোচ্ছে। তাকে ধাক্কা দিলাম, এই ওঠ ওঠ। তিনটে বাজে।

কী হয়েছে! সুনন্দ তড়াক করে উঠে বসল।

আর কতক্ষণ ঘুমোবি! শোন না–তোকে কতগুলো জিনিস জিজ্ঞেস করব।

কী? সুনন্দ চোখ কচলাতে কচলাতে বলে।

আচ্ছা, ফসিলের বয়স জানা যায় কী করে?

আধুনিক পদ্ধতি হচ্ছে তেজস্ক্রিয়তা পরীক্ষা করা। রেডিও-অ্যাক্টিভিটি টেস্ট। প্রস্তরীভূত কঙ্কাল অথবা যে পাথরের ভিতর ফসিলটা আটকে আছে তার মধ্যে ইউরেনিয়াম, পটাশিয়াম, থোরিয়াম ইত্যাদি কোনো তেজস্ক্রিয় পদার্থ থাকলে রাসায়নিক পরীক্ষা করে সহজেই ফসিলের বয়স ঠিক করা যায়।

আর যদি তেজস্ক্রিয় পদার্থ না থাকে?

তখন দেখতে হবে কোন ভূ-স্তরে ফসিলটা পাওয়া গেছে। সেই স্তরের বয়স কত? অথবা সেই স্তরে অন্য যেসব উদ্ভিদ বা জীবের ফসিল পাওয়া যাচ্ছে তারা কত পুরনো। ইতিমধ্যে বিজ্ঞানীরা অনেক পাথর এবং ফসিলের বয়স বের করে ফেলেছেন। সেরকম কোনো জানা ফসিল বা পাথরের সঙ্গে মিলিয়ে যে ফসিলটা আবিষ্কার হল তারও বয়স অনেকটা জানা যাবে।

কিন্তু ঐ মুঙ্গু মানে দ্বীপের ফসিলের বয়স বুঝবি কী করে? রাসায়নিক পরীক্ষা হল না, কোথায় পাওয়া গেছে জানা নেই। তবে?

এফসিলটা জলের মতো সহজ। এর জন্যে পরীক্ষার দরকার হয় না। স্রেফ দেখেই বলা যায়। কারণ আরকিঅপটেরিক্স-এর বয়স বের করা আছে। এটা যে তারই পূর্বপুরুষ তোর মতো গাধাও চোখে দেখে বলে দিতে পারে!

ও! তা তুই বলতে পারলি না কেন? বললি গিরগিটি।

মামাবাবুর মতো আমার অত অভিজ্ঞতা নেই। তাছাড়া আরকিঅপটেরিক্স-এর ফসিল আমি চোখে দেখিনি, শুধু ছবি দেখেছি। তারপর অন্ধকার ঘর, ধোঁয়া, কিন্তু পরে ঠিক বলেছিলাম, মামাবাবুর স্কেচ দেখেই। তবে তফাতটা ধরতে দেরি হচ্ছিল। বুঝতে পারছিলাম দুটো এক নয়, কিন্তু নার্ভাস লাগছিল। আর একটু সময় পেলেই–

.

১১.

কটা দিন রীতিমতো উত্তেজনার মধ্যে কেটেছে।

আমার ও সুনন্দর আলোচনার প্রধান বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে এই আবিষ্কার।

আমরা আরও দুদিন মুম্বুর সামনে যাগযজ্ঞ করেছি। ফসিল সম্বন্ধে মামাবাবুর ধারণা আরও দৃঢ় হয়েছে। সুনন্দও উৎসাহের মাথায় আমাকে আরও একদফা লেকচার দিয়েছে। পাখির উৎপত্তি, বিবর্তন ইত্যাদি নিয়ে, মামাবাবুর ইচ্ছে ফসিলের ফোটো তোলেন। কিন্তু অন্ধকার ঘরে ফ্ল্যাস ছাড়া ছবি উঠবে না। আর আমাদের একটি বাল্বও আস্ত নেই।

দ্বীপের লোকের চোখে আমরা প্রায় অবতার বনে গেছি। মুঙ্গুকে স্বচক্ষে দেখেও যে তারা এবং আমরা উভয় পক্ষই বহাল তবিয়তে টিকে আছি এমন অভাবনীয় কাণ্ড তারা কল্পনাও করতে পারেনি।

আর কামাউ? অনুভব করছি সর্বদা সে আমাদের মস্তকে যাবতীয় অভিশাপ বর্ষণ করে। চলেছে। বয়ে গেছে, আমরা থোড়াই কেয়ার করি। তবে শুধু যে শাপমন্নি করে কামাউ হাত গুটিয়ে বসে ছিল না, অচিরেই টের পেলাম হাড়ে হাড়ে।

ইতিমধ্যে আমরা এক নতুন তথ্য জেনেছি।

মুঙ্গু দর্শনের পরের দিন। মামাবাবু আমাদের বলেছিলেন, টোটো এলে আমায় ডেকো। ওর সঙ্গে কথা আছে। সন্ধ্যায় টোটো আসতেই মামাবাবুকে ডাকলাম।

মামাবাবুকে কাছে আসতে দেখেই টোটো কঁচুমাচু হয়ে গেল। রাশভারি মামাবাবুকে সে এড়িয়ে চলত। হাসিমুখে বললেন, টোটো, খবর কী? সর্দারের ছেলে কেমন আছে?

একদম ভালো হয়ে গেছে, ঘুরে বেড়াচ্ছে।

বেশ বেশ। সুসংবাদ। আচ্ছা এই মুহূকে তোমরা কদ্দিন পুজো করছ? অনেকদিন?

আমরা পুজো করব কেন? ও তো কামাউয়ের দেবতা! আমরা কোনো মূর্তিপুজো করি না।

সেকি! আমরা তিনজনেই অবাক।

কামাউয়ের দেবতা, কিন্তু তোমাদের নয়? আশ্চর্য। কামাউ কি তোমাদের জাতের লোক নয়? মামাবাবু জিজ্ঞাসা করলেন।

নয়ই তো, ও ভিন্ন জাতের লোক। সাদা মানুষেরা ওকে ধরে নিয়ে যায়। দাস করে রেখে, খুব খাঁটিয়েছিল। অত্যাচার করেছিল। তারপর একদিন সে পালায়। আমাদের গায়ে এসে আশ্রয় চায়। তখন থেকে আমাদের সঙ্গে আছে।

তা বাইরের জাতের লোক কামাউ তোমাদের মাহুঙ্গা হল কী করে?–মামাবাবু গভীর আগ্রহে প্রশ্ন করেন।

ও কিনা অনেক ওষুধ-টষুধ জানে। আর ম্যাজিক দেখাত। তাই আমাদের জাতে ওর খুব খাতির হল। তারপর আমাদের পুরনো মাহুঙ্গা মরে গেলে ও হল নতুন মাহুঙ্গা।

মাহুঙ্গা কী? আমি বলি।

উইচ-ডক্টর! ওঝা। মামাবাবু উত্তর দিলেন।

অ্যাঁ! ওঝা হয়ে গেল, কেউ আপত্তি করল না? আমি বললাম।

ও বাব্বা, কার অত সাহস! কামাউ ভীষণ লোক। সবাই ওকে ভয় করে। তাছাড়া অসুখ-বিসুখ হলে, সাপে কাটলে, জানোয়ারে কামড়ালে বা দুষ্ট অপদেবতা ভর করলে ও ছাড়া আমাদের গতি নেই।

তুমি এত কথা জানলে কী করে? মামাবাবু বলেন।

ঠাকুমার মুখে শুনেছি। ইস, কী ভালো যে গল্প বলত ঠাকুমা, যদি শুনতে, কত রকম কথাই জানত। কিন্তু কী করে শুনবে, ঠাকুমা আমার মরে গেছে চার বছর হল।

টোটো তার ঠাকুমার আরও কিছু প্রশস্তি গাইতে যাচ্ছিল, মামাবাবু থামিয়ে দিলেন—

আচ্ছা এই মূর্তি কামাউ কোত্থেকে পেয়েছে? সঙ্গে নিয়ে এসেছিল?

মোটেই না। আমাদের গ্রামে আসার কিছুদিন পরে কামাউ হঠাৎ মুহূকে পায়। গ্রামের কাছে ছিল একটা পাথুরে খাদ। কামাউ খাদের পাশে একদিন বসে আছে, এমন সময় চড়চড় করে পাথর ফেটে গেল, ভিতর থেকে আবির্ভূত হলেন মুঙ্গু। কামাউ তখুনি পাথর কেটে তাকে নিয়ে এল।

বাঃ চমৎকার, মিলে যাচ্ছে। মামাবাবু আমাদের উদ্দেশ করে বললেন। ডেয়ারিং বিলও দেখেছিল গ্রামের কাছে এক উপত্যকা, সেখানে কালো রঙের পাথরের স্তর।

এ কদ্দিন আগের ঘটনা? মামাবাবু টোটোকে জিজ্ঞেস করলেন। কদ্দিন হবে? টোটো গালে হাত দিয়ে ভাবল। ঠাকুমা বলেছিল এখানে আসার বেশ কিছু বছর আগে।

কিন্তু কামাউয়ের দেবতার সামনে তোমরা নাচগান করো কেন? সুনন্দ কিঞ্চিৎ উত্তপ্ত হয়ে বলল।

আজ করছি, প্রথমে করতাম না। ঠাকুমা বলেছে, প্রথম প্রথম কামাউ নাকি একা একা কুটিরের ভিতর মুঙ্গুর পুজো করত। করে সে নাকি দৈবশক্তি পায়। আমাদের জাতের কেউ কাছে যেত না, আমল দিত না। পরে যখন ওর দাপট বাড়ল, গ্রামে কোনো বড় উৎসব হলে ও মুলুকে নিয়ে আসত নাচ-গানের আসরে। প্রথম দিকে কেউ কেউ বলেছিল, ওর দেবতার সামনে আমরা নাচব কেন? কিন্তু বেশির ভাগ ওর দলে। কামাউকে তাদের দারুণ বিশ্বাস। তাছাড়া লোকটা ভয়ঙ্কর। ঠাকুমা বলত, ও নাকি বাণ মারতে জানে। তোমার ওপর কোনো কারণে চটে গেছে, রাত্তিরে তুমি ঘুমোত গেলে, কোনো অসুখ-বিসুখ নেই। ওমা, সকালে সবাই দেখবে মরা কাঠ হয়ে আছ।

হুম্। তোমার ঠাকুমা দেখছি অনেক গল্প বলেছে।

মামাবাবুর মন্তব্যে উৎসাহিত হয়ে টোটো বলল, ঠাকুমা যে কত গল্প জানত! সব মনে ছিল।

বেশ শুনব আর একদিন। মামাবাবু চিন্তান্বিতভাবে তাঁবুতে ঢুকে যান।

রাত্রে মামাবাবু বললেন, এতক্ষণে বুঝলাম কামাউয়ের প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও কেন সর্দার আমার প্রস্তাবে রাজি হয়েছিল। ফন্দিটা এঁটেছিলাম বটে, কিন্তু রীতিমতো সন্দেহ ছিল। কতটা খাটবে। নিজেদের দেবতা হলে খুব সম্ভব ছেলের প্রাণ গেলেও সর্দার ধর্মের আইনকানুন ভাঙত না। আমাদের মূর্তি দেখতে দিত না। কিন্তু ও তো কামাউয়ের দেবতা। কাজেই ছেলের প্রাণ বাঁচাতে নিয়ম বদলানো যেতে পারে।

ঐ জন্যে কামাউয়ের সঙ্গে সর্দারের অত তর্ক হচ্ছিল। সুনন্দ বলল, উঃ! কী ক্ষেপেছিল ওঝাটা, কিছুতেই দেখতে দেবে না। শেষে সর্দার জোর করে অর্ডার দিল তবে–

প্রথমবার মুঙ্গুদর্শনের পর চতুর্থ দিন।

আমি ও সুনন্দ বনপথে আসছি হঠাৎ সর্দারের সঙ্গে মুখোমুখি। দুজন সঙ্গী নিয়ে সে আসছিল। সর্দারকে দেখে সুনন্দ হেঁকে বলল, এই যে সর্দার, কোত্থেকে? তারপর তোমাদের নৌকো আবার ওপারে যাচ্ছে কবে?

দিন পনের-ষোল পরে।

বেশ বেশ। যাবার দিন দুই আগে আমাদের খবর দিও কিন্তু। একেবারে শেষ সময়ে বললে হু করে বেরনো মুশকিল। গোছগাছ করতে হবে, সংসার পেতে বসেছি।

সুনন্দের উচ্ছ্বাসে সর্দারের কিন্তু বিন্দুমাত্র ভাবান্তর দেখা গেল না। বলল, তোমরা এখন যাবে না।

অ্যাঁ! সে কি! কথাটা যেন বিশ্বাস হয় না। বোধহয় শুনতে ভুল করেছি।

তোমাদের এখন যাওয়া হবে না। সর্দার পুনরুক্তি করে।

তবে কবে যাব? আমাদের ওষুধ তো শেষ হয়ে যাবে দিন পনেরোর মধ্যে। তারপর এখানে থাকব কী করতে?

নতুন ওষুধ বানাও। এদেশ থেকে যখন এই ভীষণ রোগ একদম চলে যাবে, আর একটা লোকও হোমার অপদেবতার কবলে পড়বে না, তখন তোমাদের ছুটি। আমাদের অভিশাপ মুক্ত করে দাও, তোমাদের সসম্মানে দেশে ফিরিয়ে দিয়ে আসব।

কিন্তু সর্দার ওষুধ বানাব কী করে? সেসব মালমশলা এদেশে পাব কোথায়? দেশে যাই, অনেক ওষুধ তোমাদের বানিয়ে দেব। আমরা নিজেরা ওষুধ নিয়ে এসে রোগ একেবারে তাড়িয়ে দেব দ্বীপ থেকে।

না, এখন যাওয়া চলবে না। আগে কাঁপুনিরোগ সারুক। সর্দার দৃঢ় স্বরে বলে।

কী মুশকিল, ওষুধ পাব কোথায়? বানাও।

বারবার ঐ এক কথা। সুনন্দ অধীর হয়ে ওঠে। এখানে বসে ওষুধ বানানো আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়–

হ্যাঁ সম্ভব, আমি জানি। সর্দারের গলায় উষ্মা ফুটে ওঠে।

কী করে জানলে? সুনন্দ আশ্চর্য হয়ে বলে, কে বলল?

কামাউ বলেছে। ও তোমাদের কাছে ওষুধ শিখতে গিয়েছিল। তোমরা বলেছ–ওষুধ বানাতে পারি, কিন্তু আমরা ছাড়া অন্য লোকের হাতে সে-ওষুধ কাজ করবে না।

মিথ্যে কথা। ডাহা মিথ্যুক। আমাদের কাছে ও ওষুধ শিখতে গিয়েছিল ঠিক। আমরা এও বলেছি ওষুধ যার-তার হাতে কাজ করে না। কিন্তু এখানে ওষুধ বানাতে পারব, একথা কক্ষনো বলিনি। আসলে ও আমাদের বিপদে ফেলতে চায়। আমাদের হিংসেয় একথা বলেছে।

হিংসে কেন?

ও অ্যাদ্দিন ওঝাগিরি করছে, কিন্তু ওর দাওয়াইয়ের চেয়ে আমাদের ওষুধের জোর বেশি। রোগ সারছে। লোকে আমাদের খাতির-যত্ন করছে। এটা ও সহ্য করতে পারছে না।

সর্দার ঘাড় নাড়তে থাকে। আমাদের যুক্তি তার কাছে খুব বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় না। উঁহু, তোমরা এত ম্যাজিক মন্ত্র-তন্ত্র জানো, আর ওষুধ বানাতে জানো না। তা কি হয়?

বিশ্বাস করো সর্দার, সত্যি পারি না। সুনন্দের কণ্ঠে অনুনয়, আমাদের মিছিমিছি। আটকে রেখে কোনো লাভ নেই।

সর্দারের ভ্রমরকৃষ্ণ মুখমণ্ডল রাগে বেগুনি হয়ে গেল। কণ্ঠস্বর গম্ভীর, কর্কশ।

পারবে। পারতেই হবে। তোমরা আমাকে ধোঁকা দিচ্ছ। এ তোমাদের পালাবার মতলব। সব বুঝি। আমি অত বোকা নই। একবার দেশে ফিরলে আর তোমাদের পাত্তা পাব ভেবেছ? দেখ, আমাদের মরণের মুখে ফেলে রেখে তোমরা দিব্যি সটকান দেবে, তা হচ্ছে না। মতলব করে ওষুধ যদি না বানাও, আমরা যদি মরি, জেনে রেখো তোমরাও প্রাণে বাঁচবে না। চল–

সর্দার তার সঙ্গীদের প্রতি আদেশ দিয়ে সোজা হাঁটা দিল।

আমরা হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে থাকি।

সুনন্দ হঠাৎ তার লম্বা পা ফেলে গ্রামের দিকে এগোতে থাকে।

কোথায় চললি?

কামাউয়ের খোঁজে।

কেন?

কিঞ্চিৎ শিক্ষা দেব শয়তানটাকে।

দাঁড়া। আমি দৌড়ে গিয়ে তার হাত চেপে ধরি।

বলি, কোনো লাভ নেই। কামাউকে ঠ্যাঙালেই সর্দার আমাদের কথা বিশ্বাস করবে ভেবেছিস? বরং কেস আরও খারাপ হবে। এখন টেস্টে চল।

মামাবাবু সব শুনে বললেন, হুম? প্রতিশোধ! খুব স্বাভাবিক। আমরা ওর ভাত মারার জোগাড় করেছি, ও কি ছেড়ে কথা কইবে? আমি আঁচ করেছিলাম ও কিছু মতলব ভাজছে। যাকগে ভালোই হল।

সে কী! আমরা হতবাক।

মামাবাবু! সুনন্দ কাতরে ওঠে, ভবিষ্যৎটা ভেবে দেখেছেন? দুদিন পরে ম্যালেরিয়ার ট্যাবলেট শেষ। সঙ্গে সঙ্গে আমরাও খতম, এদের হাতে বেগুনপোড়া হতে আমার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই।

আমারও নেই। অসিত, তোমার?

মোটেও না। মরি মরব, বীরের মতো মরব। খুঁটির আগায় রোস্ট হচ্ছি না।

ঠিক ঠিক!

তবে যে বলছেন ভালোই হল? আমি প্রশ্ন করলাম।

কারণ আমি একটা দোটানায় পড়েছিলাম। তার সমাধান হয়ে গেল।

কীরকম?

সমস্যাটা হল, যদি এদের নৌকো চেপে ফিরে যাই একজনের কিন্তু যাওয়া হচ্ছে না।

কার?

মুঙ্গুর। এই মহামূল্যবান বৈজ্ঞানিক সম্পদটি ছেড়ে রেখে যাই কী করে? কেন ফিরে এসে নিয়ে যাব। সুনন্দ বলল। মামাবাবু হাসেন। কী ভেবেছ? এরা তোমায় তাদের দেবতাকে দান করবে?

তবে জোর করে নেব। তাহলে এদের তুমি চেন না। একটি প্রাণ বেঁচে থাকতে ওরা দেবতা ছাড়বে না। সুনন্দ বলল, কিন্তু দেবতা তো কামাউয়ের, অন্যদের অত মাথাব্যথা কীসের?

তাহলেও দেবে না। কারণ আমরা বিদেশি। মাঝ থেকে জোরজার করতে গিয়ে হয়তো চিরকালের মতো ফসিলটা হারাব এবং অনর্থক কিছু প্রাণ নষ্ট হবে।

তাহলে উপায়?

উপায় পালানো। নৌকো চুরি করে আমরা লুকিয়ে সমুদ্র পাড়ি দেব। মুহূকেও সঙ্গে নেব চুরি করে। নিরাপদে ফিরে যাব, নাকি জেনে শুনে এত বড় রিস্কটা নেব? তাই ভাবছিলাম। আমি একা থাকলে দ্বিতীয় পন্থাটাই ধরতাম, কিন্তু তোমরা রয়েছ, মাঝিরা আছে। ভালোয় ভালোয় উপকূলে পৌঁছুতে পারব কি না কে জানে! যাক, আপাতত একটি পথই এখন খোলা।

কামাউয়ের মুঙ্গুকে চুরি করবেন? সুনন্দের মুখ হাসি-হাসি।

কামাউয়ের দেবতা বলেই তো চুরি করব। নইলে যদি জানতাম, এই উপজাতির কাছে এ-মূর্তি অতি পবিত্র, মূর্তি হারালে তারা বিষম ব্যথা পাবে মনে, বিজ্ঞানের খাতিরেও আমি এ-কাজ করতে পারতাম না। কিন্তু সেদিন টোটোর কথায় পরিষ্কার হয়ে গেছে যে দ্বীপের লোকেরা কামাউয়ের মুহূকে ভক্তি করে না, ভয় করে।

আমি বললাম, কামাউ নিজেই কত মুঞ্জুকে ভক্তিশ্রদ্ধা করে সন্দেহ আছে। ধূর্ত লোক, নিজের ক্ষমতা বাড়ানোর জন্যে একটা অদ্ভুত দেখতে মূর্তি খাড়া করেছে। এটা তার পুরুষানুক্রমের দেবতাও নয়।

মুঙ্গু উধাও হলে কামাউ দারুণ প্রেস্টিজ খোয়াবে। লোকে ভাববে দেবতা নেই, অতএব তার দৈবশক্তিও বুঝি গেল এবার। সুনন্দ খুশিমুখে মন্তব্য করে।

আশা করছি তোমাদের মনস্কামনা পূর্ণ হবে। মামাবাবু হাসতে হাসতে বললেন, তোমরা ওর ওপর খুব চটে আছ দেখছি। যাক। বলো নৌকো চালানো কতটা রপ্ত করলে? মনে রেখো ছিপনৌকো নাও পাওয়া যেতে পারে। ওগুলো থাকে ডাঙায়, অনেক দূরে। যেতে হবে ডিঙি বা মাঝারি নৌকো চড়ে।

সনন্দ চিন্তিত স্বরে বলল, সেটা এক হিসেবে ভালোই। কারণ ডিঙি আমরা বেশি চড়ি। চিপ বাইতে শিখিনি। কিছুটা আমি রপ্ত করেছি। অসিতও মোটামুটি পারবে। তবে ঢেউ বেশি উঠলে সামলাতে পারব কি?

আকাশ পরিষ্কার দেখে বেরোতে হবে। সমুদ্র যেদিন শান্ত, দিন নয়, বলা উচিত রাতে। কারণ রাতের অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে পালাতে হবে। তবে যতটা শক্ত ভাবছ তত কঠিন নাও হতে পারে। দ্বীপের পশ্চিম পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে মোজাম্বিক স্রোত। এই তে গিয়ে ঠেকেছে তটভূমির গায়ে। নৌকো কিছুটা দক্ষিণ-পশ্চিমে চালিয়ে নিয়ে মোজাম্বিক স্রোতের টানে পড়তে পারলেই আর ভাবনা নেই। ঠিক হাজির হয়ে যাব মহাদেশের কূলে। শুধু নৌকো ভাসিয়ে রাখতে পারলেই হল। বন্দী মাঝি দুজনকেও সঙ্গে নেব। তারাও সাহায্য করতে পারবে।

আমি বললাম, মাঝিদের মুক্ত করতে গিয়ে আবার নতুন হাঙ্গামা বাধবে না তো? যদি ধরা পড়ে যাই!

কিন্তু ওদের ফেলে রেখেও তো যাওয়া যায় না। আমরা পালালে ওদের পরিণতি কী দাঁড়াবে ভেবে দেখেছ? স্রেফ থোড় কুচো করে ফেলবে রাগে। অবশ্য সবচেয়ে কঠিন কর্ম কী করে মৃত্যুকে চুরি করা যায়। যাহোক, এসব প্ল্যান আমি ভেবে-চিন্তে ঠিক করছি। তোমাদের কর্তব্য, যতটা পারো নৌকো চালানো প্রাকটিস করা। তবে সাবধান, ওরা যেন ঘুণাক্ষরেও আমাদের মতলব টের না পায়। তাহলে সর্বনাশ ঘটবে।

.

১২.

এরপর ক-দিন ধরে আমরা প্রবল উৎসাহে নৌকো চালানো প্র্যাকটিস করলাম। কামাউকে দেখতাম দূরে থেকে বাঁকা দৃষ্টি দিয়ে আমাদের কার্যকলাপ লক্ষ করছে। সুনন্দ মাঝে মাঝে কটমটিয়ে তাকে দেখে দাঁতে দাঁত চেপে বলে, ব্যাটা শকুনি, ব্যাটা শয়তান। একবার বাগে পাই তো দেখাই মজা।

দিন চারেক পর মামাবাবু তার প্ল্যান উপস্থিত করলেন।

সকালবেলা চা খেতে খেতে বললেন, আমরা পরশু পালাব।

পরশু কেন?

কারণ ঐ দিন দ্বীপে এক উৎসব আছে। হই-হল্লাটা একটু গুরুতর হবে। উৎসবের শেষে সবাই নিঃসাড়ে ঘুমোবে, সেই ফাঁকে–

মুঙ্গু? বন্দী মাঝি দুজন?

হুঁ, বলছি সব। মাঝিদের সঙ্গে আমি যোগাযোগ করেছি। দেখেছ রাত্রিতে তারা একটা কুটিরে বন্দী থাকে। হাত শক্ত করে দড়ি দিয়ে বাঁধা থাকে খুঁটোর সঙ্গে। দুজনে ঘরের দুপ্রান্তে। এক হাতে সে গিট খোলা অসম্ভব। কিন্তু একখানা ধারালো ছুরি পেলে তারা অনায়াসে বাঁধন কেটে প্রস্তুত হয়ে থাকবে। তারপর নির্দিষ্ট সময়ে শিসের সংকেত শুনলেই বেরোবে।

বেরোবে কী করে? আমি বলি, বাঁশ মাটির দেওয়াল বেশ মজবুত। দরজা ঝাঁপ দিয়ে আটকানো থাকে—

বেরোবে চাল ফুটো করে। ঘাস-পাতার চাল ফাঁক করা শক্ত নয়। হা, ওদের একটা ছুরি দিয়ে আসতে হবে। অসিত, তুমি এই ভার নাও। সুযোগমতো কুটিরের পিছনে দক্ষিণ কোণে গিয়ে আস্তে দু-বার শিস দেবে। ভিতর থেকে উত্তর আসবে–একবার শিস। দেখবে মাটি থেকে দু-ফুট ওপরে দেওয়ালের গায়ে ছোট ফুটো। আমি করে রেখেছি। পাশে ক্রশ চিহ্ন। তুমি খোলা ছুরিটা ফোকরের মধ্য দিয়ে গলিয়ে ফেলে দেবে। ব্যস, ছুরি

পড়বে আবদুলের পাশে। পালাবার চরম সংকেত পাওয়ামাত্র ওরা বেরিয়ে এসে সোজা সমুদ্রতীরে হাজির হবে।

এইবার আসছে মুঙ্গু অপহরণপর্ব। এইটাই সবচেয়ে জটিল কাজ। তোমরা দেখেছ মঙ্গুর কুটিরের দরজা খোলা হয় দিনে একবার। সান্ধ্য আসর বসবার মুখে। কামাউ তার পুজো করে। তারপর চব্বিশ ঘণ্টা নিশ্চিন্ত। কেউ মুঙ্গুর খোঁজ করে না। অতএব এই সময়ের মধ্যে কাজ হাসিল করতে হবে। গিরগিটি অবতারকে সরাতে হবে উৎসবের শেষে। যখন সকলে নেচে-কুঁদে ক্লান্ত হয়ে ঘুমোচ্ছে। দিনের বেলা বা উৎসব চলার সময় চুরি করা অসম্ভব, কারণ যে কারো চোখে পড়ে যেতে পারি। চত্বর থেকে পরিষ্কার দেখা যায় কুটিরটা। সুনন্দ, এটা তোমার ডিউটি। পাতলা দেয়াল কেটে ভিতরে ঢুকবে। তারপর ফসিলটা নিয়ে সোজা সমুদ্রতীরে চলে যাবে, নৌকোর কাছে। আমি আর অসিত যাব ক্যাম্প থেকে। দু-চারটে প্রয়োজনীয় জিনিস শুধু সঙ্গে নেব। আর আহত মাঝিদের ডেকে নেব। অতঃপর নৌকো জলে নামানো ও দুর্গা বলে সাগরের বুকে পাড়ি।

ভোররাত্রে বেরোলে একটা মাত্র বিপদ থেকে যাচ্ছে যে আমরা দ্বীপ থেকে বেশি দূরে সরে যেতে পারছি না। ভোরে উঠে দ্বীপবাসীরা যখন টের পাবে পাখি পালিয়েছে, তারা তৎক্ষণাৎ ছিপ নিয়ে তাড়া করবে। হয়তো মাঝপথে ধরেও ফেলতে পারে। যাহোক, এ ঝুঁকিটুকু আমাদের নিতেই হচ্ছে, উপায় নেই। আরও আগে বেরোতে পারলে ভালো হত। এদের মুঠো থেকে অনেক দূরে সরে যেতে পারতাম।

সুনন্দ বলল, যদি উৎসব ছাড়া অন্য কোনোদিন পালাই। সেসব দিন অনেক আগে এদের আসর ভাঙে।

সেসব দিন সম্ভব নয় ঐ কামাউ বুড়োর জন্যে।

কেন?

কামাউয়ের ঘর মুঙ্গুর কুটিরের একদম লাগোয়া। আমি লক্ষ্য করেছি, বুড়োটা রাত্রে ভালো ঘুমোয় না। প্রায়ই জেগে থাকে। খক খক করে কাশে। লোকটার আবার কান ভারি সজাগ। তবে উৎসবের দিন প্রচুর নেচে-কুঁদে আর কড়া নেশার পানীয় গিলে ঘুমটা নিশ্চয় ওর গাঢ় হবে। তাছাড়া উৎসবের পর বেশিরভাগ সময়ই এরা কুটিরে ঘুমোতেই যায় না, চত্বরেই লম্বা হয়। সুতরাং পরশুই উপযুক্ত দিন।

বুঝলাম সব দিকে হুঁশ রেখেই মামাবাবু পরিকল্পনা তৈরি করেছেন।

মামাবাবু বললেন, সাবধান! খুব সতর্ক হয়ে কাজ করবে। একটু সন্দেহ হলেই সঙ্গে সঙ্গে কাবার!

সমস্ত দিন এক চাপা উত্তেজনার মধ্যে আছি। নানা সম্ভব-অসম্ভব আশঙ্কা মনের মধ্যে ঘরপাক খাচ্ছে। কাউকে বলছি না। ভাববে ভীতু। সুনন্দও ঘাবড়েছে। তবে ভান করছে। যেন এ তো ছেলেখেলা। শুধু একবার মনের ক্ষোভ প্রকাশ পেল।

ব্যাজার মুখে বলল, যত শক্ত কাজ দেখছি আমার ঘাড়ে। ঐ ভারী পাথরখানা বয়ে নিয়ে অতটা পথ হাঁটা! বাপরে! দেশি-বিদেশি যত জানা দেবদেবী আছেন সবাইকে স্মরণ করছি। হে মা, হে বাবা, ভালোয় ভাসোয় পার করে দিও।

সত্যি বলতে কি একটু উৎসাহও লাগছে। অ্যাডভেঞ্চারের বই পড়েছি কত। এবার একেবারে হাতেনাতে এক্সপেরিমেন্ট। যেমন বিচিত্রভাবে আমাদের এই দ্বীপে আগমন, তেমনি রোমাঞ্চকর প্রস্থান (পলায়নও বলতে পারেন। দেশে ফিরলে নির্ঘাত হিরো বনে যাব। খবরের কাগজে ছবিটবি বেরিয়ে যাবে। অবশ্য যদি ফিরি।

সেদিন রাতে টোটোর সঙ্গে গল্প হচ্ছিল তাঁবুর সামনে বসে। ছেলেটার ওপর মায়া পড়ে গেছে। বেচারা হঠাৎ জানবে তার বন্ধু মাহিগুিরা পালিয়েছে। পেটুক মানুষ, ভালো-মন্দ বিদেশি খানা আর জুটবে না।

টোটো বলছিল তাদের জাতির অতীত গৌরবের কাহিনি।

বাবা-জ্যাঠারা বলে, দূর দূর এ কী জীবন? শিকার নেই। যুদ্ধ নেই। তোরা ছাগল বনে গেছিস। কী সব দিন ছিল আমাদের সেই জঙ্গলের দেশে। বর্শা দিয়ে সিংহ শিকার দেখেছিস? তির ছুঁড়ে প্রকাণ্ড দাঁতাল হাতিকে পেড়ে ফেলতাম। হায়, সেসব দিন গেল কোথায়! এইটুকু দ্বীপে বন্দী হয়ে আছি। কাজের মধ্যে কেবল নৌকো চড়া। ছছাঃ ছেঃ! যতসব মেয়েলিপনা! তার চেয়ে তির ছুঁড়ে নারকেল পাড়া ঢের শক্ত।

এ-দ্বীপে তোমরা এলে কেন? আমি প্রশ্ন করি।

বাধ্য হয়ে, যুদ্ধে হেরে। আমার তো এখানেই জন্ম। শুনেছি পাশের গ্রামের ওঙ্গামিদের সঙ্গে ছিল আমাদের দারুণ শত্রুতা। বার বার যুদ্ধ হত। ওঙ্গামিরা পারত না। শেষে একবার তারা অতর্কিতে আক্রমণ করল। আমরা প্রস্তুত হবার সুযোগটুকু পেলাম না। আমাদের বেশির ভাগ পুরুষ মরল। বাকিরা মেয়ে আর বাচ্চাদের নিয়ে পালালো। ওসামিরা সহজে ছাড়েনি। সমুদ্রতীর অবধি পিছন পিছন তেড়ে এসেছিল। একেবারে ঝাড়ে-বংশে শেষ করে দেবার মতলব আর কী! ওদের ভয়েই আমরা এই দ্বীপে পালিয়ে আসি। দেখ না, আজও ওপারে গিয়ে আমরা বেশিদিন থাকি না। ঐ ওঙ্গামিদের ভয়ে। তবে আবার ফিরব।

কবে?

সর্দার বলেছে। আমরা আরও সংখ্যায় বাড়ি। যুদ্ধ জানা যুবকে যখন আমাদের দল বেশ ভারী হবে তখন ফিরব সেই জঙ্গলের দেশে। ওঙ্গামিদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হয়ে। কিন্তু ইদানীং সবাই খুব মুষড়ে পড়েছে। এই মারাত্মক কাঁপুনি জ্বরে আমাদের গায়ের জোর কমে যাচ্ছে। লোকও মরছে। ওঙ্গামিদের সঙ্গে লড়ব কী করে?

ওঙ্গামিদের সঙ্গে তোমাদের শত্রুতার কারণ কী?

কেন জানো? ওগামিরা ছিল ঐ অঞ্চলের প্রভু। আমরা গিয়ে জমিতে ভাগ বসাতে ভয়ানক চটে যায়। ফলে প্রাণপণে আমাদের তাড়াতে চেষ্টা করে।

ও তোমরা বুঝি অন্য দেশ থেকে এসেছিলে? কোথায় ছিলে আগে?

আমরা আগে ছিলাম আরও গভীর বনের রাজ্যে। আকাশছোঁয়া এক পাহাড়ের গায়ের কাছে আমাদের গ্রাম। সেই তো আমাদের আসল দেশ।

সেখান থেকে এলে কেন?

ভয়ে।

কীসের ভয়?

মোটো। মালিমা ইয়া মোটো।

মামাবাবু! সুনন্দ ডাকে।

কি? মামাবাবু বই থেকে মুখ তোলেন।

মোটো। মালিমা ইয়া মোটো মানে কী?

মোটো মানে আগুন। মালিমা ইয়া মোটো মানে হচ্ছে আগ্নেয়গিরি বা অগ্ন্যুৎপাত। কোথায় শুনলে কথাটা?

টোটো বলছে, ওদের আদি বাসস্থান নাকি ছিল গভীর জঙ্গলে। পাহাড়ের কোলে। সেখান থেকে পালিয়ে আসে আগুনের ভয়ে।

তাই নাকি? মামাবাবু কৌতূহলী হলেন, ব্যাপারটা কী হয়েছিল টোটো?

টোটো বলল, আমি ঠাকুমার মুখে শুনেছি। উঃ, সে এক ভীষণ ব্যাপার। আমার বাবা তখন ছোট, এই আমার মতো। ঠাকুমার মুখে সে-গল্প শুনলে বুঝতে কী সাংঘাতিক

কাণ্ড! আমি তেমন জমিয়ে বলতে পারব না। কিন্তু ঠাকুমাকে আর পাবে কোথা? ঠাকুমা তো মরে গেছে।

বেশ তুমিই বলো শুনি।

টোটো বলল, ঐ পাথরের মধ্যে ছিল অগ্নিদেবতার বাস। মাঝে মাঝে গুড়্গুড়্ আওয়াজ উঠত। চোঙার মতো মাথা দিয়ে বেরতো কালো ধোঁয়া। গরম হাওয়া। শব্দটা বাড়তে লাগল। সবাই বলল, দেবতা রেগেছে। ভালো করে পুজো দিতে হবে। কিন্তু পুজো দেবার আর সময় পাওয়া গেল না। সেদিন রাত্তিরে পাহাড়ের মাথা থেকে ঝলকে ঝলকে অগ্নিদেবের গরম নিশ্বাস বের হতে লাগল। মাটি তেতে উঠল। আকাশে ধোঁয়া, নিশ্বাস নিতে কষ্ট হয়। সবাই বলল, পালাও। এক্ষুনি। দেবতার রোষে নইলে কেউ রক্ষা পাবে না। গ্রামসুদ্ধ পালিয়ে চলল। পালাতে পালাতে আরম্ভ হল আগুনবৃষ্টি। জ্বলন্ত পাথর ছুটতে লাগল। পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে এল শত শত আগুনের ধারা। মানুষ পশুপাখি সবাই ছুটল দিশেহারা হয়ে, প্রাণের ভয়ে। অনেকে মরল পাথরের ঘায়ে। আমার ঠাকুর্দা এক হাতে ঠাকুমাকে অন্য হাতে বাবাকে ধরে হিচড়াতে হিচড়াতে টেনে নিয়ে চলল। উঃ! কী ভীষণ রাত্রি! যারা বাঁচল, কোনোরকমে গিয়ে উঠল দূরে এক পাহাড়ে।

পরদিন দুপুর নাগাদ এক বিকট শব্দ। সে কী কান-ফাটানো আওয়াজ! মনে হল সৃষ্টি বুঝি ভেঙে গুঁড়িয়ে উড়ে গেল। প্রচণ্ড আলোর ঝলক ও ভয়ঙ্কর শব্দে অনেকক্ষণ সবাই হতবুদ্ধি হয়ে রইল। সম্বিত ফিরতে দেখল আগুন দেবতার বাসা সেই উঁচু পাহাড়ের

ডগাটা ফেটে চুরচুর হয়ে উড়ে গেছে। আর সেই মাথাভাঙা পাহাড়ের ভিতর থেকে নেমে আসছে অজস্র জ্বলন্ত স্রোত। মস্ত মস্ত পাথর ছিটকাচ্ছে। আবার ছোট ছোট। অনেক দূরে এক সমতলে এসে সবাই থামল। সেখানে তৈরি করল নতুন গ্রাম। জায়গাটা চমৎকার ছিল। প্রচুর শিকার। কিন্তু জুটল এক নতুন হাঙ্গামা,–ওঙ্গামি। তাদের সঙ্গে ঝগড়া আর কিছুতেই মিটল না।

এই দ্বীপেও অগ্নিদেব আছে নাকি? মামাবাবু মৃদু হেসে জিজ্ঞেস করেন।

কে জানে, থাকতে পারে! তবে শুনিনি তো কখনও। থাকলে তো মরেছি। ঠাকুমা বলত, অগ্নিদেব ঘুমিয়ে থাকে মাটির নিচে, একদিন হঠাৎ জাগে। তখন তার মেজাজ হয় অগ্নিশর্মা। ধারে কাছে কারো তখন রক্ষা নেই।

টোটো, তুমি দেখছি বড্ড ভয় পাও অগ্নিদেবকে। মামাবাবু ঠাট্টা করতে লাগলেন।

ডরাব না? কী রাগী দেবতা! আমি আর কী ডরাই! আমার বাপ-জ্যাঠা, ঐ দারুণ সাহসী বীর সর্দার সব্বাই অগ্নিদেবের নামে ভয়ে কাঁটা হয়ে থাকে। একটা দড়াম করে শব্দ হোক, খানিকটা আগুন দেখা যাক, দু-চারটে পাথর ছুটুক–আর চেঁচিয়ে বলুন–অগ্নিদেব সাবধান! ঊর্ধ্বশ্বাসে সব পালাবে, অন্ধের মতো। একবার পিছন ফিরে দেখতে ভরসা পাবে, গাছ পড়ল না মশাল ছুঁড়ল কেউ। আমরা ছয় চাঁদ অন্তর একবার ঘটা করে অগ্নিদেবের পুজো দিই।

টোটো ফিরে যেতেই মামাবাবু বলে উঠলেন, আমাদের প্ল্যান কিছু বদলাতে হবে।

কীরকম? আমরা উদ্বিগ্ন হই।

পরশু আমরা সমুদ্রযাত্রা করছি না। সেদিন হবে শুধু এক অংশ-মুঙ্গু অপহরণ পর্ব।

তারপর?

তারপর সমুদ্রে ভাসছি, মানে ফাইনালি চম্পট দিচ্ছি যে কোনোদিন সুবিধা মতো।

সুনন্দ বলল, পরদিন কুটিরের দরজা খুলে যখন দেখবে মুঙ্গু নেই, তখন যদি আমাদের সন্দেহ করে?

দরজাই থাকবে না, তো খুলবে কী? মুঙ্গুর কুটির বা দরজার কোনো চিহ্নই থাকবে না।

সেকি! আমরা তো অবাক।

কী করে?

মাফিয়া-যাত্রার সময় ডক্টর হাইনের অর্ডারমাফিক কয়েকটা ডিনামাইট স্টিক সঙ্গে নিয়েছিলাম মনে আছে? মনে হয় স্টিকগুলো নষ্ট হয়নি, ফাটবে। পরশু উৎসবের শেষে যখন এরা অচেতন হয়ে ঘুমোবে, তোমরা দুজনে মুঙ্গুর কুটিরের দেয়াল ফুটো করে। ফসিলটা সরাবে। নিয়ে আসবে ক্যাম্পে। না, ক্যাম্পে রাখা ঠিক হবে না। কাছাকাছি কোনো গর্তটর্ত আছে, ফসিলটা লুকিয়ে রাখা যেতে পারে?

আছে। সামনের ঐ প্রকাণ্ড গাছটার গুঁড়ির ওপর দিকে একটা মস্ত গর্ত আছে। ফসিলটা পুরো ঢুকে যাবে।

বেশ। ভালো করে শুকনো পাতা চাপা দিয়ে রাখবে। তারপর আবার ফিরে যাবে মুঙ্গুর কুটিরে। কুটিরের নিচে একটা গর্ত খুঁড়ে তোমরা পয়লা নম্বর ডিনামাইটটা ফিক্স করবে। তারপর আরও দুটো লাগাবে কুটিরের পিছনে যে ঢিবি আছে তার নিচে। ঢিবির ওপর মস্ত একটা গাছ আছে। আমার আশা ডিনামাইট ফাটলে হয়তো উল্টে পড়বে। ব্যস, রাত্তিরে এই অবধি। কারণ বিস্ফোরণ ঘটবে সকালে। স্টিকের পলতেগুলো বেশ লম্বা নেবে আর ঘাস-পাতা দিয়ে চাপা দিয়ে রাখবে, যাতে কারও চোখে না পড়ে।

পরদিন আমরা যাব রুগী দেখতে, আমি আর অসিত। সুনন্দ গোপনে গিয়ে ডিনামাইটের পলতেতে আগুন লাগাবে। তারপর চট করে আমাদের কাছে চলে আসবে। পলতের আগুন স্টিকে পৌঁছতে লাগবে বড়জোর চার-পাঁচ মিনিট। তুমি প্রথমে মুঙ্গর কুটিরের

নিচে লাগানো ফিউজে আগুন দেবে, আর তার দশ-পনেরো সেকেন্ড পরে আগুন দিও বাকি দুটো পলতেয়। এরপর কী ঘটবে স্বচক্ষেই দেখতে পাবে।

সুনন্দ বলল, কিন্তু এত কষ্ট করার কারণ তো বুঝছি না? পরশুদিন সবাই মিলে কেটে পড়লেই তো হাঙ্গামা চুকে যায়।

কারণ শেষ রাতে সমুদ্রযাত্রাটা এড়াতে চাই। যদি মাঝপথে ধরা পড়ি? মুস্তকে আগে থাকতে সরিয়ে রাখলে প্রথম রাতেই পালাতে পারব। অবশ্য ফেরা দু-একদিন পিছিয়ে যাবে। তাতে কিছু এসে যায় না, অনেক নিরাপদে ফিরব।

ব্যাপারটা ঠিক মাথায় ঢুকছিল না। ডিনামাইট ফাটিয়ে আমাদের কী উপকার হচ্ছে? বললাম, যদি ওরা বিস্ফোরণের জন্য আমাদের দায়ী করে?

না করবে না। মামাবাবু বলেন, কী শুনলে এতক্ষণ টোটোর গল্প? ভাববে অগ্নিদেবের কাণ্ড। কোনো মানুষ যে এমন ব্যাপার ঘটাতে পারে মাথায়ই আসবে না। বরং লেগে যাবে অগ্নিদেবের ক্রোধ নিবারণের জন্য ঘটা করে পুজো দিত। এই তালেগোলে আমরা পালাব।

উৎসবের রাতে আমি ও সুনন্দ কীভাবে মহামান্য মুলুকে অপহরণ করলাম, কীভাবে ডিনামাইটগুলি বসালাম, তার বিশদ বিবরণ দেবার দরকার নেই। শুধু বলে রাখি, সে-

রাতে ঘুম আমাদের ভাগ্যে জোটেনি এবং কাজ শেষে তাঁবুতে যখন ফিরেছি হাত-পিঠ টনটন করছিল, সারা গায়ে ঘাম।

পরদিন সকালে চত্বরে গিয়ে দেখি অনেকেই তখনও নাক ডাকাচ্ছে বা ঝিমুচ্ছে। গত রাত্রের ফুর্তির ধকল সামলে উঠতে পারেনি। রুগী দেখা হল। মামাবাবু সর্দারের সঙ্গে খোশগল্প জুড়ে দিলেন। কামাউকে দেখলাম এক কোণে বসে ঢুলছে।

সুনন্দ একটু পরেই এল।

মামাবাবু বাংলায় বললেন, কি, সব রেডি?

হ্যাঁ।

বেশ এখন কথা বলতে বলতে গাছের আড়ালে সরে যাও। পাথর ছিটকাতে পারে।

গুড়ম্-ম্-ম্।

ঘড়ির ওপর চোখ রেখে প্রস্তুত হয়েই ছিলাম, তবু এত কাছে ডিনামাইট ফাটায় চমকে কান চেপে বসে পড়লাম। মাটি, পাথর, বাঁশের টুকরো ছিটকে পড়ল চারপাশে। দেখলাম মুঙ্গুর কুটির বেমালুম নিশ্চিহ্ন।

প্রথম কয়েক মুহূর্ত হতভম্ব অবস্থা। তারপরই শুরু হল চিৎকার দৌড়াদৌড়ি। সদ্য ঘুমভাঙা লোকগুলো দিশাহারার মতো এদিক সেদিক ছুটল। তাদের বিপর্যস্ত স্নায়ু ধাতস্থ হবার আগেই আবার বিস্ফোরণ দু-দুটো।

ছোট-বড় পাথরের খণ্ড দুমদাম্ করে পড়ল চারপাশে। একটা গাছ মড়মড় শব্দে মুখ থুবড়ে পড়ল। কয়েকজন দেখলাম আহত হয়েছে।

আতঙ্কে সবাই প্রায় উন্মাদ হয়ে গেল। মালিমা ইয়া মোটো–মালিমা ইয়া মোটো বলে চেঁচাতে চেঁচাতে সবাই উর্বশ্বাসে দৌড়ল। আমরাও ছুটলাম সঙ্গে-বাবাগো মাগো, বলে চিল্লাতে চিল্লাতে। তারপর টুক করে একসময় কেটে পড়ে ক্যাম্পে ঢুকে পড়লাম। দ্বীপের লোকেরা ছুটে চলল সমুদ্রের তীরে। প্রায় পনেরো-কুড়ি মিনিট ধরে শুনলাম সমুদ্রতীর থেকে ভেসে আসছে তুমুল হট্টগোল হইচই। আস্তে আস্তে কোলাহল শান্ত হল।

ঘণ্টাখানেক পরে মামাবাবু বললেন, কী ব্যাপার? একটা লোকেরও গলার আওয়াজ পাচ্ছি না যে! চল তো দেখে আসি।

সমুদ্রতীরে এসে আমরা থ।

বেলাভূমি খাঁ-খাঁ করছে। জনমনিষ্যি নেই। গা একেবারে ফাঁকা নয় অবশ্য। কয়েকজন বুড়োবুড়িকে দেখলাম পাথরের খাঁজে, গাছের তলায় লুকিয়ে বসে। কিন্তু বাকিরা কই!

এবার নজর পড়ল। একটাও নৌকো নেই। ডিঙি ছিপ সব উধাও, দেখি অনেক দূরে সমুদ্রের জলে কালো কালো বিন্দুর মতো সার সার নৌকো, ভেসে চলেছে উপকূলের দিকে।

যাব্বাবা! সুনন্দ বলে, এ যে গুষ্টিসুদ্ধ হাওয়া! যাক ভালোই হল, এখন থেকে আমরাই দ্বীপের রাজা।

হুঁ রাজা বটে! তবে নির্বাসিত। মামাবাবু মন্তব্য করলেন।

কেন?

বাঃ, সবকটা নৌকো যে নিয়ে গেছে। দ্বীপ থেকে বেরোবার রাস্তা বন্ধ।

তাইতো! আমরা একটু মুষড়ে পড়ি।

এরা আর ফিরবে না? আমি জিজ্ঞেস করি।

ফিরতে পারে। অগ্নিদেবের ধ্বংসলীলা কতদূর গড়ায় দেখেশুনে হয়তো ফিরবে। তবে কবে ফিরবে কে জানে! যাহোক, সুনন্দ অসিত তোমরা পালা করে সমুদ্রতীরে পাহারা দাও। আমার ধারণা শব্দ উপকূল অবধি পৌঁছেছে। কিংবা দ্বীপের রিফিউজিদের কাছ থেকে খবর পেয়েও উপকূল থেকে খোঁজ নিতে আসতে পারে–ব্যাপারখানা কী!

পরদিন সকালে আরও দুটি ডিনামাইট ফাটানো হল। সেই বিকট বজ্রনিনাদ দ্বীপের চারপাশের জলবেষ্টনীর তরঙ্গে তরঙ্গে কাঁপুনি জাগিয়ে ছুটে গেল দূর দিগন্তে। মহাভয়ে পশুপাখিরা দিভ্রান্ত হয়ে পালাতে লাগল। মানুষ তো আগেই পালিয়েছে।

বন্দী মাঝি দুজন আবদুল ও রশিদ মহানন্দে দ্বীপময় চষছে। কতদিন পরে তারা স্বাধীনভাবে ঘুরছে। একটা নতুন খবর দিল তারা–শুধু কিছু বুড়োবুড়ি নয়, কয়েকজন জোয়ান পুরুষও নাকি রয়েছে দ্বীপে। কী কারণে তারা পালাতে পারেনি জানি না। হয়তো ভয় পেয়ে বনের মধ্যে লুকিয়ে ছিল, অন্যরা তখন ভেগেছে।

মাঝিরা বলল, বনের মধ্যে হঠাৎ দুটো লোক তাদের সামনে পড়ে। অমনি তারা তোক দুটোকে লাঠি বাগিয়ে তাড়া করে। দ্বীপের লোকের ওপর তাদের ভীষণ রাগ। লোক দুটোও তৎক্ষণাৎ ভোঁ দৌড়়।আবদুলরা খুব বাহাদুরি নিল, ব্যাটারা ভিতুর একশেষ। সঙ্গে তির-ধনুক ছিল, কিন্তু দেখেই পালাল। একবার ধরতে পারলে

আমাদের ধারণা ওরা মোটেই ভীতু নয়। আকস্মিক দুর্যোগে বেচারারা ঘাবড়ে গেছে। হয়তো ভেবেছে–বিস্ফোরণের পিছনে ভারতীয় জাদুকরদের কোনো কারসাজি আছে। কারণ কাল থেকে দ্বীপের কোনো লোক আমাদের ধারে কাছে ঘেঁষেনি। দেখলেই লুকিয়ে পড়েছে।

দুপুর বারোটা নাগাদ।

আমি ও সুনন্দ সমুদ্রতীরে রাউন্ড দিচ্ছি। সুনন্দের চোখে দূরবিন। হঠাৎ সে চেঁচিয়ে ওঠে, লঞ্চ! একটা লঞ্চ আসছে এদিকে!

কই দেখি, দেখি। আমি তার হাত থেকে দূরবিন কেড়ে নিই। সত্যি তো লঞ্চ! কয়েকজন মানুষ রয়েছে। ঠিক চেনা যাচ্ছে না তাদের।

দে দে। সুনন্দ কাড়াকাড়ি করে। কিন্তু আমি শক্ত হাতে দূরবিন ধরে থাকি।

একটু একটু করে স্পষ্ট হতে থাকে লঞ্চ। দূরবিনের মধ্য দিয়ে মানুষগুলোকে দেখি।

সুনন্দ! ডক্টর হাইনে! ঐ তো ওকেলো! আরও তিন-চারজন লোক দেখছি, বোধহয় খালাসি।

সুনন্দ দূরবিন কেড়ে নিল। তারপর বলে চলে, হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক বলেছিস। হাইনে, ওকেলো।

সুনন্দ তার শার্টটা খুলে প্রাণপণে নাড়তে লাগল। আর গলা ফাটিয়ে চেঁচায়, ও-কে-লো! হাইনে!

দুম্‌দুম্‌। লঞ্চ থেকে গুলির আওয়াজ ভেসে এল। অর্থাৎ তারা আমাদের দেখেছে।

দাঁড়া মামাবাবুকে ডেকে আনি। সুনন্দ পাই-পাঁই করে দৌড়ল।

.

১৩.

লঞ্চ থামল দ্বীপ থেকে প্রায় দুশো গজ দূরে। তীরের কাছে কাছে জলের মধ্যে অজস্র শিলাস্তূপ, প্রবাল প্রাচীর। লঞ্চের ধাক্কা খাওয়ার সম্ভাবনা। একটা ছোট বোট জলে নামানো হল। তাতে চাপলেন ডক্টর হাইনে এবং ওকেলো। দুজন খালাসি দাঁড় বাইতে লাগল।

হাইনে লাফ দিয়ে ডাঙায় নেমে ছুটে এসে জড়িয়ে ধরলেন মামাবাবুকে।

ওঃ প্রোফেসর ঘোষ। আপনারা জীবিত!

কেন সন্দেহ আছে নাকি? কী দেখছেন সামনে? ভূত? মামাবাবু হাসেন। হাত দিয়ে অনুভব করুন খাঁটি রক্তমাংসের শরীর। আরও সাচ্চা প্রমাণ ঐ দেখুন ছায়া পড়েছে মাটিতে।

উঃ কী মনোকষ্টে যে দিন কাটাচ্ছিলাম! অনুতাপে পুড়ে যাচ্ছিল বুক। আমারই জন্যে এই দুর্ঘটনা! কেন আপনাদের মাফিয়া আসতে লিখলাম! কী যে আনন্দ হচ্ছে আমার, কী করে বোঝাই। পাষাণ-ভার নেমে গেল মন থেকে।

আমি ও সুনন্দ তখন আনন্দে উন্মত্ত ওকেলোর অক্টোপাস-সম ভীমবাহুপাশের আলিঙ্গনে দমবন্ধ হয়ে ছটফট করছি। প্লিজ ওকেলো, ভাই এবার ছেড়ে দাও। এবার কিন্তু সত্যি সত্যি অক্কা পাব।

হাইনে বললেন, মাফিয়ায় আপনাদের জন্য অপেক্ষা করে বসে আছি। চারদিন কেটে গেল, দেখাই নেই। আবার খবর পাঠাই, কই, চটপট চলে এসো।

ওকেলো টেলিগ্রাম করল, আপনারা রওনা দিয়েছেন চারদিন আগে! কী ব্যাপার? সঙ্গে সঙ্গে ডার-এস-সালাম ফিরলাম। তারপর জানি, রুফিজি নদীর মোহনা থেকে আপনারা

রওনা হওয়ার কয়েক ঘন্টা পরে প্রবল ঝড় ওঠে। বুঝলাম ঝড়ে পড়েছেন। মোহনার দুইপাশ, কাছাকাছি সমুদ্রতীর সব তন্ন তন্ন করে খুঁজলাম। নাঃ, কোনো পাত্তা নেই। জীবিত ফিরে পাবার আশা তো ছেড়েই দিয়েছিলাম। ভাবছিলাম, মৃত দেহগুলোও যদি পাই। কিন্তু কোনো চিহ্নই পাচ্ছিলাম না। এমনকি ভাঙা নৌকো বা জিনিসপত্রগুলোরও কোনো সন্ধান নেই। ভাগ্যিস এখনও আপনাদের দেশে খবর পাঠাইনি। ঠিক করেছিলাম, আপনাদের কোনো চিহ্ন না পেয়ে, স্থির নিশ্চিত না হয়ে আপনাদের আত্মীয়স্বজনের কাছে এই মর্মান্তিক সংবাদ পাঠাব না।

এত খুঁজেছেন কিন্তু এই দ্বীপটা বাদ দিলেন কেন? মামাবাবু প্রশ্ন করলেন।

রাইট, এ-দ্বীপে আমি খুঁজতে আসিনি। এত দূরে এসে পড়বেন ভাবিনি। তবে একেবারে খোঁজ নিইনি বলতে পারেন না। কিছুদিন আগে এই দ্বীপের অধিবাসীরা যখন উপকূলে এসেছিল তাদের জিজ্ঞেস করা হয়–ঝড়ে কোনো নৌকো কি তাদের দ্বীপে গিয়ে পড়েছে?–কোনো ভারতীয় ছিল নৌকোয়? তারা বলল–না।

তাহলে আমাদের খোঁজ পেলেন কী করে! ডিনামাইটের শব্দে? শব্দ তীরে পৌঁছেছিল, তবে খুব ক্ষীণ। কীসের শব্দ বোঝা মুশকিল। তারপরই হুড়মুড় করে দ্বীপবাসীরা কুলে হাজির হল। তাদের মুখে বিস্ফোরণের কাহিনি শুনে লোকেদের সন্দেহ হল অগ্ন্যুৎপাত নয়, কারণ সবাই জানে ওটা প্রবাল দ্বীপ। অতএব মানুষের হাত আছে। বারুদের কাণ্ড।

আদিবাসীরা তো বারুদের ব্যবহার জানে না।–কোনো বিদেশি গেছে দ্বীপে? তারা উত্তর দেয়–না।

তবে খবর পেলেন কী করে?

শুধু একটা ছেলে, এই ষোল-সতের বছর বয়স হবে, খবর দিল তিনজন ভারতীয় নাকি বেশ কিছুদিন ধরে তাদের দ্বীপে রয়েছে। ঝড়ে তাদের নৌকো গিয়ে দ্বীপে পড়েছিল। ছেলেটা লুকিয়ে এসেছিল। বলে গেল–কাউকে বলবেন না আমি বলছি, তাহলে সর্দার কেটে ফেলবে তাকে।

টোটো, নিশ্চয় টোটো। আমি বলে উঠলাম।

টোটো কে? হাইনে বললেন।

একটি ছেলে, আমাদের ভারি ভালোবাসে।

ডক্টর হাইনে বলেন, সব্বাইকে বলা ছিল আপনাদের সন্ধান পেলেই যেন আমাকে খবর দেওয়া হয়। গতরাত্রে ট্রাঙ্ককল পেলাম। সকালে পৌঁছেই লঞ্চ জোগাড় করে বেরিয়ে পড়েছি। কিন্তু আশ্চর্য, ওরা বার বার আপনাদের কথা চেপে গেল কেন?

কারণ ওরা চাইছিল না আমরা এখান থেকে চলে যাই।

কেন?

তাহলে হোমার খপ্পর থেকে ওদের বাঁচাবে কে?

মানে? হাইনে বিভ্রান্ত। সে আবার কে?

মামাবাবু তখন সংক্ষেপে বললেন, আমরা কেমন করে নিজের পায়ে কুড়ুল মেরেছি সেই কাহিনি।

সমস্ত শুনে হাইনে প্রথমে একচোট হাসলেন হো হো করে, বেশ হয়েছে, যেমন হাতুড়ে বদ্যি তেমনি নাছোড়বান্দা পেসেন্ট। আচ্ছা জব্দ। যাক খুব সময়ে এসে পড়েছি,

এখন লঞ্চে আরাম করে ফিরে চলুন।

ওকেলো ফোড়ন কাটল, কিন্তু সুনন্দ আসিটের কি এমন নিরামিষ প্রস্থান পছন্দ হবে? অ্যাডভেঞ্চার কই? ওরা বরং আমাদের জালিবোটটা নিয়ে সমুদ্র পাড়ি দিক। আমরা প্রোফেসরকে নিয়ে লঞ্চে চলে যাই।

আমরা দুজন সরবে আপত্তি জানাই, নেভার।

খেয়াল করলাম মামাবাবু তার গল্পের মধ্যে মুঙ্গু অর্থাৎ ফসিলের বিবরণ বেমালুম চেপে গেলেন।

ডক্টর হাইনে ব্যস্ত হয়ে বললেন, তবে আজই ফেরা যাক। আপনাদের জিনিসপত্র নিয়ে আসি? বেড়াতে এসে কী দুর্ভোগ! এতগুলো দিন আপনাদের নষ্ট হল।

মামাবাবু বললেন, দুর্ভোগ কিছুটা হয়েছে বটে, কিন্তু দিনগুলো নষ্ট হয়েছে বলতে পারি না। একেবারে শূন্য হাতে ফিরছি না। অনেক অভিজ্ঞতা পাওয়া গেছে এবং মুঙ্গু। এই আমাদের পুরস্কার!

মুঙ্গু কী?

দ্বীপের দেবতা। কিন্তু আমাদের কাছে তার পরিচয় মিসিং লিঙ্ক। সরীসৃপ ও পাখির মাঝামাঝি এক জীবের ফসিল। আরকিঅপটেরিক্স-এর পূর্বপুরুষ।

কী বললেন, মিসিং লিঙ্ক? ফসিল এখানে পেয়েছেন? হেঃ হেঃ প্রোফেসর ঘোষ, আমি কাটখোট্টা সায়ান্টিস্ট হতে পারি, কিন্তু অল্পস্বল্প রসিকতা বুঝি।

রসিকতা নয়, সিরিয়াসলি।

অ্যাঁ সত্যি? কোথায়?

ক্যাম্পে রয়েছে।

তবে চলুন, দাঁড়িয়ে কেন? ইস, এতক্ষণ আজবাজে বকে সময় নষ্ট করছেন। উত্তেজিত হাইনে মামাবাবুর হাত ধরে হ্যাঁচকা টান মারলেন।

আহা অত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? মামাবাবু কাতর কণ্ঠে জানান, পালাচ্ছে না তো?

পাতলা কাপড়ে জড়ানো অবস্থায় একটা বক্সের মধ্যে ফসিলটা শোয়ানো ছিল। কাপড় সরাতেই হাইনে তার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়লেন।

কখনো খালি চোখে, কখনো ম্যাগনিফাইং গ্লাস লাগিয়ে দেখছেন। বাহ্যজ্ঞানশূন্য, তন্ময়ভাবে। আমরা দুরুদুরু বক্ষে ভাবছি–মামাবাবুর ধারণা সত্যি হবে তো?

প্রায় আধ ঘণ্টা পর হাইনে লাফিয়ে উঠলেন, প্রোফেসর ঘোষ, কনগ্রাচুলেসনস! আপনি ঠিক ধরেছেন–মিসিং লিঙ্ক। জীবটা না-পাখি, না-সরীসৃপ। আরকিঅপটেরিক্স-এর চেয়ে পুরনো। এর গায়ে পালক খুব সামান্য, সবে বেরিয়েছে ছোট ছোট। এখন দয়া করে

বলুন এই মহামূল্যবান আবিষ্কারটি করলেন কী করে! এ যে সাত রাজার ধন মানিক! প্রাণিবিজ্ঞানীদের স্বপ্ন। এরকম আবিষ্কারের জন্যে আমি একবার কেন, সাত-সাতবার টাইফুনে পড়তে প্রস্তুত আছি।

মামাবাবু বললেন, সুনন্দ কফি বানাও, জমিয়ে বসা যাক। জানলে ডক্টর হাইনে, এরকম বিচিত্র কাহিনি অ্যাডভেঞ্চারের বইয়ে পড়া যায়। কিন্তু সত্যি সত্যি নিজেদের জীবনে তেমনি এক অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হব কে জানত?

প্রথমেই বলে রাখি এই ফসিল আবিষ্কারের অনেকখানি কৃতিত্ব ডেয়ারিং বিলের। বিল অবশ্য বুঝতে পারেনি, কিন্তু আমার তখনই সন্দেহ হয় যে ও যে-বিগ্রহটা দেখেছিল সেটা আসলে একটা ফসিল। তারপর এখানে সেই মূর্তি দেখে ভালো করে নজর করি। তখন না শুনলে হয়তো এই মূর্তি নিয়ে এত মাথাই ঘামাতাম না।

তাছাড়া ফসিলটা কোথায় পাওয়া গেছে ভেবেও কূলকিনারা পেতাম না। পরে টোটোর কথায় আমি নিঃসন্দেহ হই। কারণ এ-দ্বীপে এত পুরনো ফসিল পাওয়া অসম্ভব।

মামাবাবু মুঙ্গু আবিষ্কার কাহিনি আরম্ভ করেন।

ডক্টর হাইনে ও ওকেলো মন্ত্রমুগ্ধের মতো শোনেন।

মামাবাবু শেষ করামাত্র হাইনে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন।

ওয়ান্ডারফুল! এক নম্বর–অদ্ভুত তীক্ষ্ণ আপনার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি। বায়নোকুলারের ভিতর দিয়ে অতটুকু সময়ে চিনতে পারলেন কী করে?

না, ঠিক চিনতে তো পারিনি।

ঐ হল। আরকিওপটেরিক্স ভেবেছিলেন। সেটাই বা ক-জনের মাথায় আসবে। দ্বিতীয় নম্বর–হাইনে মিটমিট করে আমাদের দিকে তাকাতে থাকেন–দুষ্টু বুদ্ধিতেও আপনি বড় কম যান না। আচ্ছা প্যাঁচ কষে বেচারা কামাউয়ের দেবতাটিকে হাতালেন। সব্বাইকে দেশছাড়া করে ছাড়লেন মশাই।

সমবেত অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে সবাই।

হাইনে মহাখুশি হয়ে বলেন, প্রোফেসর ঘোষ, চালিয়াত মিলার এবার চিৎপটাং।

.

১৪.

স্থির হল কাল আমরা ফিরে যাব। হাইনে দ্বীপটা দেখতে উৎসাহ প্রকাশ করলেন। মামাবাবু তাকে ঘুরিয়ে দেখাবেন।

সকাল থেকে যাবার তোড়জোড় শুরু হল।

দফায় দফায় মালপত্র লঞ্চে নিয়ে যাওয়া হতে লাগল। মামাবাবু বললেন, আমি একদম শেষে যাব স্পেসিমেনের বাক্সগুলি এবং ফসিল নিয়ে। আমরাও একে একে লঞ্চে উঠি। মাঝি চারজন হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। বাব্বাঃ, জংলিগুলোর খপ্পর থেকে বেঁচে বেরোলাম তাহলে?

হাইনের ইচ্ছে ছিল মামাবাবুর সঙ্গে যাবেন। কিন্তু মামাবাবু আপত্তি করলেন, না না আপনি আগে চলে যান। জিনিসগুলো গুছিয়ে রেখে স্পেসিমেন আর ফসিলের জন্য একটু ভালো জায়গা করে রাখবেন। ঢেউয়ের দোলায় কোনো ভারী জিনিস যেন ওদের ঘাড়ে গড়িয়ে না পড়ে।

লাস্ট ট্রিপ।

লঞ্চ চালক পেড্রো ইঞ্জিন চালু করেছে। ঘোর গর্জনে থরথর করে কাঁপছে লঞ্চ। মামাবাবু এলেই সে লঞ্চ ছেড়ে দেবে।

বালির ওপর শোয়ানো মুঙ্গুকে মামাবাবু আস্তে আস্তে তুলে ধরলেন। হঠাৎ দমকা হাওয়ায় ফসিলের গায়ে জড়ানো কাপড়ের টুকরোটা হুস্ করে উড়ে গেল। মুহূর্তে ডানা মেলে উধাও হয়ে গেল কাপড়টা। মামাবাবু বোকার মতো চেয়ে রইলেন। লঞ্চে আমরা খুব একচোট হেসে উঠি এই দৃশ্য দেখে।

আমাদের হাসি থামতে না থামতে শুনি এক চিৎকার। মামাবাবু বা খালাসিদের গলা নয়। অপরিচিত কণ্ঠস্বর। এক নয়, একাধিক।

সমুদ্রতীরে মামাবাবুর কাছ থেকে প্রায় শতখানেক গজ দূরে কিছু ঝোঁপঝাড়ের অন্তরাল থেকে যেন জাদুবলে আবির্ভূত হল দুটি কৃষ্ণকায় মূর্তি। তারা চেঁচিয়ে ওঠে, মুঙ্গু মুঙ্গু! তারস্বরে কী সব জানি বলতে লাগল।

হাইনে আশ্চর্য হয়ে বলেন, কে লোক দুটো? দ্বীপের আদিবাসী? এরা বুঝি পালায়নি? কী বলছে?

আমরা দেখেই চিনেছি–সেই মানিকজোড়। ত্যাড়া-ব্যাঁকা। ত্যাড়াকে চিনতে না পারলেও ব্যাঁকার ধনুকের মতো পা ভুল হবার নয়। মুঙ্গুকে চুরি করতে দেখলে অন্য কেউ বোধ হয় খুশিই হত। কিন্তু এ দুটো কামাউয়ের চেলা। হয়তো বাধা দেবে।

আমরা বললাম, ওরা মুঙ্গুকে চিনতে পেরেছে। এতক্ষণ লুকিয়ে দেখছিল। মুঙ্গুকে ফিরিয়ে দিতে বলছে। শাসাচ্ছে।

ত্যাঁড়া-ব্যাঁকা দ্রুতবেগে বালির ওপর দিয়ে দৌড়ে আসতে লাগল।

মামাবাব মুহূর্তে হৃদয়ঙ্গম করলেন ব্যাপারটা। চটপট ফসিল বগলদাবা করে জলে নামলেন। ঝপঝপ করে ঢেউ ভেঙে এগোতে থাকেন। নৌকো রয়েছে প্রায় এক কোমর জলে।

নৌকোয় পৌঁছে ফসিলটি সাবধানে ভিতরে শুইয়ে তিনি লাফিয়ে উঠলেন। খালাসি দজন তৈরি ছিল। ঝপাং করে দাঁড় পড়ল। ঢেউ কেটে তীব্রবেগে বোট গভীর জলে এগিয়ে গেল।

লোক দুটো যখন জলের ধারে হাজির হল নৌকো অনেকখানি এগিয়ে গেছে। সাঁতার কেটে ধরা যাবে না তাকে।

ওকি! হতবাক আমরা লক্ষ করি লোক দুটো ধনুকে তির বসিয়ে জ্যা টানছে।

উল্কাগতিতে তির ছুটল। অব্যর্থ নিশানা।

আ আ আ! একজন খালাসি কাতর আর্তনাদ করে উঠল। তার বাহুমূলে তির লেগেছে। ফলাটা গেঁথে গেছে মাংসে। তার সঙ্গী একটানে তিরটা তুলে নেয়। জামাটা লাল হয়ে ওঠে তাজা রক্তে। মুঠো আলগা হয়ে তার দাঁড়টা জলে ভেসে গেল।

আবার তির ছুটল।

মামাবাবুরা সাবধান হয়ে গেছেন। উপুড় হয়ে শুয়ে পড়েছেন পাটাতনে। চালকহীন নৌকো পাক খেতে খেতে অন্ধের মতো ভেসে চলল।

আমরা প্রাণপণে চিৎকার করছি। ঘুঁসি দেখাচ্ছি–যদি লোকগুলো ভয় পায়। কিন্তু বৃথা চেষ্টা। তারা মরিয়া। গুরুদেব কামাউয়ের দেবতাকে কিছুতেই নিয়ে যেতে দেবে না।

দেখলাম, তারা ঝাঁপিয়ে পড়ল জলে, মাছের মতো সাঁতরে চলল নৌকোর দিকে।

মামাবাবু সাবধান! ওরা আসছে!

আমাদের চিৎকার তার কানে পৌঁছয়নি কিংবা তিরের ভয়ে খানিকক্ষণ মাথা তুলতে সাহস পায়নি। আমরা প্রাণপণে ডাকতে থাকি।

ত্যাঁড়া-ব্যাঁকা নৌকোর কাছে এসে পড়েছে–

বলি ব্যাপারখানা কী? পেড্রোর বাজখাঁই গলা শোনা গেল। সে এতক্ষণ ইঞ্জিনঘরে ব্যস্ত ছিল। ইঞ্জিনের প্রচণ্ড শব্দে কিছুই তার কানে ঢোকেনি। চিৎকার চরমে উঠলে শুনতে পেয়ে বেরিয়ে এসেছে।

ওই জংলি দুটো বোট আক্রমণ করেছে। সাঁতরে আসছে। তির ছুঁড়েছে। একজন আহত।

তবে রে! দৈত্যাকার পেড্রো ব্যাঘ্রলম্ফ দিয়ে তার কেবিনে ঢুকল। পরমুহূর্তে ফিরে এল, হাতে বন্দুক।

বন্দুকে টোটা ভরে সে তাক করল।

হাইনে তাড়াতাড়ি তার হাত চেপে ধরলেন, আরে করছ কী? দেখছ না লোকগুলো আর নৌকো এক লাইনে। যদি নৌকোয় গুলি লাগে?

ওঃ! অসহায় রাগে পেড্রো সজোরে পা ঠুকতে লাগল।

মামাবাবু ও খালাসিরা মাথা তুলেছে কিন্তু নৌকো এগোয় না। একটা মাত্র দাঁড। ক্রমাগত পাশে সরে যেতে লাগল। ত্যাড়া-বাকা ধরে ফেলেছে নৌকো। তারা নৌকোর চারপাশে সাঁতরায় আর সুযোগ খোঁজে ওঠবার।

একজন খালাসী দাঁড় তুলে জলের মধ্যের মাথাগুলো লক্ষ্য করে ঘা কষায়। তারা টুপটাপ ডুব দিয়ে সরে যায়। একজন হঠাৎ নৌকোর তলায় মারল ধাক্কা। খালাসিটি হুমড়ি খেয়ে পড়ল নৌকোর কানায়। অমনি তার ঘাড় ধরে মেরেছে টান। ব্যস, দাঁড় সুদ্ধ সে জলের মধ্যে গোত্তা খেয়ে পড়ল। অমনি লেগে গেল জাপটা-জাপটি।

মামাবাবু অন্যমনস্ক হয়েছিলেন জলযুদ্ধ দেখতে। অন্য লোকটা সেই সুযোগে নৌকোয় উঠে পড়ল। মারল তাঁকে এক প্রচণ্ড ধাক্কা। লোকটাকে নৌকোয় ওঠামাত্র চিনেছি–বাকা।

মামাবাবু ঠিকরে পড়লেন জলে।

আহত খালাসিটিও বাধা দেবার চেষ্টা করল। তার জামা-প্যান্ট রক্তে লাল। এক হাতে ঘুষি চালাল। কিন্তু এক প্রচণ্ড লাথি খেয়ে সে উল্টে পড়ল জলে।

ব্যাঁকা এবার নিচু হয়ে মুঙ্গুকে দুহাতে তুলে ধরল, বিজয়োল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল, পেয়েছি।

গুড়ুম! হঠাৎ কানের কাছে প্রচণ্ড শব্দ। চমকে দেখি পেড্রোর বন্দুকের নল দিয়ে ধোঁয়া বেরুচ্ছে। মুখে তার তৃপ্তির হাসি। খতম।

বাঃ, চমৎকার লক্ষ্যভেদ। টু শব্দটি করার ক্ষমতা হয়নি। ব্যাঁকা উল্টে পড়েছে নৌকোর বাইরে জলে। হাতের ফসিল নৌকোর পাটাতনে সজোরে আছড়ে পড়ল—ঠকাস্।

আমাদের দৃষ্টি মামাবাবুকে অনুসরণ করল। দেখি তিনি আহত খালাসিটিকে নিয়ে কোনো রকমে পাড়ে যাবার চেষ্টা করছেন।

দ্বিতীয় খালাসিটি ফিরে আসছে দেখলাম। নিশ্চয় যুদ্ধে তার জয়লাভ হয়েছে। সে দ্রুত সাঁতার কেটে এসে আহত সঙ্গীকে ধরল লঞ্চ থেকে একজন ঝাঁপিয়ে পড়ল জলে। তাদের সাহায্য করতে ছুটল।

নৌকো আটকাও। মামাবাবুর গলা ভেসে এল।

সত্যি তো, নৌকো কোথায়? এতক্ষণ ভুলেই গিয়েছিলাম নৌকোর কথা, লক্ষ্য করতে গিয়ে শিউরে উঠি।

দূরে নৌকোটা ঢেউয়ের মাথায় নাচতে নাচতে হেলেদুলে ছুটে চলেছে এক সর্বনাশা নিয়তির উদ্দেশে। তার লক্ষ্য কুফানি।

কুফানি? একটা ভয়ঙ্কর ঘূর্ণি। নামটা দ্বীপের লোকের দেওয়া। কুফানি মানে মৃত্যুদ্বার। যমের দক্ষিণ দুয়ারই বটে। কতগুলো ডুবো পাহাড়ের মাঝখানে সমুদ্রের জল লাটুর

মতো বন বন করে পাক খাচ্ছে। একবার তার ভিতরে গিয়ে পড়লে আর রক্ষা নেই। স্রোতের টানে পাতালে তলিয়ে যাবার আগেই স্রেফ পাথরে ধাক্কা খেতে খেতেই টুকরো হয়ে যাবে।

এ-দ্বীপের ওস্তাদ মাঝিদেরও দেখেছি সভয়ে এড়িয়ে চলত এই ঘূর্ণিকে। সুতরাং আমরা। শঙ্কিত হয়ে উঠি।

বোট বাঁচাও! মামাবাবু চিৎকার করে ওঠেন।

অসম্ভব। নৌকো এখন আমাদের নাগালের বাইরে। দেখতে দেখতে নৌকোর গতি দ্রুত থেকে দ্রুততর হল। তারপর সোজা গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল কুফানির গর্ভে।

দেখলাম চরকির মতো পাক খাচ্ছে নৌকো। তারপরই কোনো শিলাস্তূপের সঙ্গে প্রচণ্ড সংঘর্ষ হল।

নৌকোটা অন্ধের মতো ঘুরছে আর বার বার ঢুঁ মারছে কঠিন পাথরে। যেন সেই নিষ্ঠুর ফাঁদ থেকে বেরিয়ে আসতে প্রাণপণ চেষ্টা করছে। ক্রমশ সেটা জলের ভিতর ডুবে যেতে লাগল, তারপর হঠাৎ দেখি আর নেই। অদৃশ্য। শুধু কয়েকটা ছোট তক্তা ঘুরপাক খাচ্ছে।

সবাই হায় হায় করে উঠলাম।

একটা নৌকো গেলে কী এসে যায়? কিন্তু ওর সঙ্গে যে তলিয়ে গেল মামাবাবুর আবিষ্কার। বিজ্ঞানজগতের এক অমূল্যনিধি। কেমব্রিজের মিলারকে শায়েস্তা করার হাতিয়ার। কামাউয়ের মুঙ্গু!

পেড্রো দুম করে পা ঠুকে খালাসিদের উদ্দেশে গর্জন ছাড়ে, তোরা উজবুক, অকম্মার ধাড়ি! একটু সময় থাকতে ডাকতে পারলি না? পেড্রোর বন্দুকের কথা মনেই পড়ল না। হতভাগাদের? দেখতাম ঐ জংলি দুটো কী করে নৌকোর কাছে ঘেঁষে! ওফ্!

মামাবাবু লঞ্চে উঠে টলতে টলতে এক কোণে বসে পড়লেন। তার সারা গা থেকে জল ঝরছে, চোখে বিষণ্ণ উদাস দৃষ্টি। যেন সর্বহারা। আমরা স্তব্ধ হয়ে দেখছিলাম। কাছে যেতে বা কথা কইতে সাহস হচ্ছিল না।

আহত খালাসিটিকে লঞ্চে তোলা হল। মামাবাবু একবার বলে ওঠেন, অ্যানটিসেপটিক দিয়ে ভালো করে ব্যান্ডেজ করো। ব্যান্ডেজ ওষুধ কোথায় আছে?

সুনন্দ বলল, জানি। ব্যস, মামাবাবু আবার চুপ মেরে গেলেন।

আহত লোকটিকে ড্রেস করে শুইয়ে দিয়ে বেরিয়ে এসে দেখি মামাবাবু তখনও একভাবে বসে।

ডক্টর হাইনে গিয়ে মামাবাবুর সামনে দাঁড়ালেন। প্রোফেসর ঘোষ এবার উঠুন। পোশাক চেঞ্জ করে নিন। সবই বুঝছি, কিন্তু কী করবেন? মামাবাবু দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেন।

হুঁ, যা বলেছেন। দুর্ভাগ্য। অতি দুর্ভাগ্য। আমার, আপনার, সারা বিজ্ঞানজগতের। কিন্তু হারানো সূত্রের আর একটি স্পেসিমেন আমি নিশ্চয় জোগাড় করব। তবে খাটতে হবে, সময় লাগবে।

কী করে? ডক্টর হাইনে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেন।

কেন? সেই উপত্যকার কথা ভুলে যাচ্ছেন? ডেয়ারিং বিল যার উল্লেখ করেছিল। বিল সেখানে দেখেছিল কালো পাথরের স্তর। সেখানেই ফাটলের মধ্যে কামাউ খুঁজে পেয়েছিল মুঙ্গুকে–এই ফসিল। ডার-এস-সালাম ফিরে গিয়ে আমাদের কাজ হবে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নাইভাসা হ্রদের দিকে যাত্রা করা। বিলের কুটির হ্রদের কাছে। তাকে সঙ্গে নিয়ে যাব। সেই উপত্যকায়। ভালো করে খুঁজে দেখলে এই প্রাণীর আরও দু-একটা ফসিল আবিষ্কার করা হয়তো অসম্ভব হবে না। কী বলেন হের হাইনে?

হাইনে বললেন, রাইট!